KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৭/১ ১৭/২ ১৭/৩ ১৭/৪	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪ কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪ মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬৪

আই-এ-সি ভাইকাউণ্ট বিমানে ভ্রমণ করা সত্যই আরামদায়ক

চারিটি টার্বো-প্রপ রোল্‌স্ রয়েস্ ইঞ্জিন চালিত ভাইকাউণ্ট আকাশ-ভ্রমণে নূতন মানের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘণ্টায় ৩২০ মাইল গতিতে গমন করিয়া ইহা মাত্র ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে দিল্লী এবং ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে রেঙ্গুন পৌছায়।

ইহা পৃথিবীর সাধারণ আবহাওয়ার উপরে উড়িয়া সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক আকাশপথে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়। এবং বিরক্তিকর শব্দ ও কম্পন হইতে মুক্ত, সম্পুর্ণভাবে চাপ নিয়ন্ত্রিত। ইহা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও কোমল আরামদায়ক আসন এবং বৃহৎ প্যানোরামিক জানালা সন্নিবেশিত। উপযুক্তরূপে নিযুক্ত ক্রু দ্বারা পরিচালিত। এই বিমানটিতে ভ্রমণের সময় সর্বদা দুইজন এয়ার-হোষ্টেস আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকে এবং উপাদেয় খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর মতে আই-এ-সির ভাইকাউণ্ট বিমানই সর্বোত্তম।

বর্তমানে আই-এ-সির ভাইকাউণ্ট বিমান কলিকাতা—দিল্লী; কলিকাতা—রেঙ্গুন; দিল্লী—বোম্বাই; বোম্বাই—করাচী এবং বোম্বাই—মাদ্রাজ—কলম্বো পথে যাতায়াত করে।

শীঘ্রই আই-এ-সির অন্যান্য প্রধান পথে
আরও ভাইকাউণ্ট বিমান চলাচল করিবে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স্ করপোরেশন
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা, ১৩
ফোন : ২৩-৫১৪১ (১০ লাইন)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ মস্কোতে পাঁচ সপ্তাহ ২১৭

আনন্দ বাগচী ॥ কালান্তর ২২৩

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ অভীপ্সা ২২৪

শামসুর রহমান ॥ অপাঙ্‌ক্তেয় ২২৫

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ॥ আশ্চর্যের দিকে ২২৭

অশোক মিত্র ॥ মার্ক্স, সার্ত্র, শ্রীমতী বোভোয়া ২২৮

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ নীল রাত্রি ২৩৪

কাজী আব্দুল ওদুদ ॥ শরৎচন্দ্র ২৬৪

লীলা মজুমদার ॥ আধুনিক সাহিত্য ৩০৪

সমালোচনা—গৌরীনাথ শাস্ত্রী, নরেশ গুহ,
সরোজ আচার্য, নৃপেন্দ্র সান্যাল ও
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৩০৭

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্য…

দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী অন্তহীন বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/G

মস্কোতে পাঁচ সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

১৯৫৬ সালে পৃথিবীর তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে জাপান গিয়েছিলাম, মে-জুন মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি মস্কো যাবার সুযোগ ঘটল। আমেরিকার বিষয়ে 'চতুরঙ্গে' খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। ভবিষ্যতে কোনোদিন জাপান সম্বন্ধেও কিছু বলবার ইচ্ছা আছে। আজ সোভিয়েট রুশে যা দেখেছিলাম, তারই বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব।

শুরুতেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কোনো দেশকে সঠিকভাবে জানতে হলে তার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, ওতপ্রোতভাবে দেশের লোকের সঙ্গে মেলা মেশা প্রয়োজন। পাঁচ সপ্তাহের সফরে তার সুযোগ মিলবে কোথায়? তাই আমার মতন পাঁচ সপ্তাহের পর্যটকের পক্ষে কোনো দেশের জীবনের পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়া কেবল কঠিন নয়, বোধহয় অসম্ভব। আমার এ-লেখায় যদি কেউ রুশদেশ বা রুশ জাতির বিশদ ও সম্পূর্ণ ছবি দেখতে চান, তাঁকে হতাশ হতে হবে। সে-দেশের জীবনযাত্রার ধারা আমার মনে কি প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তারই হালকা বিবরণ হিসাবেই এ-ধরনের রচনার খানিকটা সার্থকতা থাকলেও থাকতে পারে।

নিজের দেশকেই কজন মানুষ ভালো করে জানে? ভারতবর্ষের বিষয়ে ভারতবাসীর লেখায় এত বিরুদ্ধমতের পরিচয় মিলবে যে অসতর্ক বিদেশী পাঠক দিশেহারা হয়ে পড়বেন। তাতে আশ্চর্য হবারও কোনো কারণ নেই। বিরাট দেশ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-রীতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের সমাবেশে ভারতবর্ষে যে বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ করা সহজ নয়। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই আমরা যা দেখতে চাই, তাই দেখি। ইচ্ছার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও শক্তির প্রশ্ন থেকে যায়। যা দেখবার বা বোঝবার শক্তি নেই তাকে দেখব বা বুঝব কি করে?

ছয়জন অন্ধের হাতি দেখার মতন ভারতবর্ষের বিবরণও তাই দেশী ও বিদেশী লেখকদের রচনায় বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। সব দেশের বেলায়ই একথা খাটে, তবু যে-দেশ আয়তনে যত বড়, জনসংখ্যার বৈচিত্র্য ও সমাবেশ যত বেশি, তার বেলায় এ-প্রশ্ন তত বেশি

জটিল হয়ে ওঠে।

অন্য দেশের তুলনায় রুশ দেশের সঠিক বিবরণ দেওয়া বোধ হয় আরো কঠিন। পৃথিবীর নানা জাতি বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রজা। পূর্ব সীমানা থেকে পশ্চিম সীমানায় পৌঁছতে হলে প্রায় আট-দশ হাজার মাইলের রাস্তা অতিক্রম করতে হয়, উত্তর থেকে দক্ষিণের পাড়িও কয়েক হাজার মাইল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের চেয়ে আয়তনে প্রায় তিনগুণ বড়। সোভিয়েট রাষ্ট্র বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চার গুণ হবে। এতবড় বিরাট স্থলসমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রে মিলবে না। চীন, ব্রেজিল বা অস্ট্রেলিয়াও আয়তনে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। বিরাট আয়তনের ফলে আবহাওয়ার বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক সংস্থানের পার্থক্য মানুষের আচার-ব্যবহার এবং জীবনরীতিকেও বিচিত্র ও বিভিন্ন করে তুলেছে।

বিরাট রাষ্ট্র এবং সে-রাষ্ট্র প্রকৃতির সহজ বিধানে একীভূত নয়। অস্ট্রেলিয়া আয়তনে বিরাট কিন্তু সাগরের বন্ধনে সমস্ত দেশ একসূত্রে বাঁধা। হিমালয়ের প্রাচীর এবং দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সাগর-পরিখায় সীমাবদ্ধ ভারতবর্ষও প্রাকৃতিক বিধানেই এক বিরাট দেশ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বর্তমান বিস্তারের কিন্তু সে-রকম কোনো নৈসর্গিক ভিত্তি মিলবে না। ভাষা, জাতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের পার্থক্য তো রয়েছেই; সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐতিহাসিক ঐক্যের পরিচয়ও মিলবে না। প্রায় সাত-আটশত বছর ধরে রুশসাম্রাজ্য ধীরে-ধীরে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে নিজেকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছে, এবং তার ফলে মস্কোভির ক্ষুদ্র রাজ্য আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরাট বিস্তৃতিতে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাস ও ভূগোলের ধারা রুশসাম্রাজ্যকে যে-বৈচিত্র্য দিয়েছিল, রুশবিপ্লবের পরে সে-বৈচিত্র্য কমে নি, বরং বেড়েছে। বিপ্লবোত্তর রুশদেশে মানুষের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সবকিছুকেই ঢেলে সাজার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে পুরানো পৃথিবীর প্রচলিত জীবনধারার যে রীতি, অনেক বিষয়েই রুশসমাজে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে-ব্যতিক্রম মানুষের মনেও নানা ঘাতপ্রতিঘাত তুলেছে। কৃষ্ণভক্ত যেমন কৃষ্ণনামে আত্মহারা হয়ে পড়েন, ভালোমন্দকে শান্তভাবে বিচার করতে ভুলে যান, সাম্যবাদের নামে বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও তেমনি ভাববিহ্বলতা এসে যায়। সোভিয়েট বলতে তাঁরা ভক্তিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সাম্যবাদের যাঁরা বিরোধী তাঁদের মনে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাম্যবাদের প্রতি তাঁদের যে বিরাগ, সে-বিরাগ রুশদেশ ও জাতির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আবিল করে তোলে, গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে রুশ রাষ্ট্রের যে কোনো উন্নতি হয়েছে সে-কথা স্বীকার করতে তাঁদের বুক ফেটে যায়।

ভক্তি বা বিদ্বেষের মাত্রা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয়ে শান্তভাবে বিচার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ এমনভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে যে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ পরস্পরের প্রতিবেশী। তাই ধনতান্ত্রিক দেশকেও সোভিয়েট রুশ সম্বন্ধে জানতে হবে, রুশদেশেও আমেরিকা বা ইয়োরোপ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণার প্রয়োজন। এরকম পারস্পরিক মন-জানাজানি এবং সহযোগিতা আজ মানুষের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষায়, শিল্পে ও বিজ্ঞানে সোভিয়েট রাষ্ট্র গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। যাঁরা সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সংগঠনের বিরোধী,

স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির পরে তাঁদের সমালোচনাও অনেকখানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আকাশে সোভিয়েট-চন্দ্রের পরিক্রমার ফলে কিন্তু উল্টো এক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের নবতম অবদান সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকের দান, কিন্তু বহু দেশের বহু বৈজ্ঞানিকের সমবেত সাধনার ফলেই যে এ-বিস্ময়কর বিকাশ সম্ভব হয়েছে সে-কথা ভুলে গিয়ে তার সমস্ত কৃতিত্ব সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক, এবং তার দৌলতে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দেবার এক মনোবৃত্তি আজ বহু বুদ্ধিমান লোকের মনেও গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকের সাফল্যে অনেকে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার মধ্যেও যে গলদ রয়েছে, কঠিন মূল্য দিয়ে রুশদেশের মানুষ বিজ্ঞানে এ-উন্নতি অর্জন করেছে, সে-কথা আজ তাঁরা ভুলতে বসেছেন।

২

মস্কোতে আমি মোটে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, এবং তারও অনেকখানি সময় হাসপাতালে কেটেছিল। তার ফলে আমার অন্যান্য সঙ্গীদের মতন অবাধে আমি ঘুরতে পারিনি। তাঁদের মুখে-শোনা কথার উপরেও আমাকে অনেকখানি নির্ভর করতে হয়েছে। হাসপাতালে থাকায় কিন্তু আমার একটা বড় লাভ হয়েছিল। সমস্ত সমাজব্যবস্থার পার্থক্য, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্ত শৃঙ্খলা ও বন্ধনের আড়ালে মানুষের মনে মানুষের প্রতি যে-দরদ, তার যে-পরিচয় আমি মস্কোতে পেয়েছি, হাসপাতালে না থাকলে বোধ হয় কোনোদিন তা মিলত না। আরো একটা লাভ হয়েছিল যে যাঁরাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁরা ঘরোয়াভাবে যতখানি স্বাধীনতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, সরকারীভাবে দেখাশোনায় তার সুযোগ মিলত কিনা সে-কথা বলা কঠিন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ কী ভাবে, তাদের মনের গতি কোন দিকে চলেছে, বিদেশীর পক্ষে তা জানা প্রায় অসম্ভব। একে তো ভাষার বিরাট ব্যবধান। খুব কম ভারত-বাসীই রুশভাষা জানে আর রুশদেশেও খুব কম লোকেই অন্য ভাষা জানে। তাছাড়া অন্য ভাষা জানলেও রুশবাসী সহজে তা ব্যবহার করতে চায় না। আমি যে হাসপাতালে ছিলাম, বিভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিদের জন্যই সে-হাসপাতাল নির্দিষ্ট, অথচ সেখানেও ডাক্তার-নার্সদের মধ্যে অন্য ভাষার ব্যবহার নেই বললেই চলে। আমেরিকায় ইংলণ্ডে সুইজারল্যাণ্ডে হোটেলে পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য টেলিফোন কর্মচারীরা বহু-ভাষাভাষী। মস্কোতে হোটেল দূরে থাক, বিদেশীর জন্য নির্ধারিত হাসপাতালেও ইংরাজী, ফরাসী ও জর্মন ভাষা প্রায় অচল। তার ফলে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে আলাপও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মস্কোতে শুধু ভাষার মুশকিল রয়েছে, তা নয়। ভাবের আদান-প্রদানের মুশকিল আরো বেশি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষ বিদেশী দেখলে আগ্রহ করে আলাপ করতে আসে, তাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করে, নিজেদের দেশের কথা বলে। মস্কোতে সাধারণ মানুষ বিদেশীর প্রতি বন্ধুত্বমনোভাবাপন্ন, এবং নানাভাবে আতিথেয়তা প্রকাশ করতে চায়। মস্কোতে আমাদের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁদের কাছে শুনেছি যে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করবার এ-আগ্রহ সাম্প্রতিক বিকাশ। স্টালিনের যুগে ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া কেউ বিদেশীর সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে আসতে নাকি সাহস পেত না। বর্তমানে রুশ নাগরিক বিদেশীকে সম্ভাষণ করে, আদর-আপ্যায়নও করতে চায়, কিন্তু দেশ বা বিদেশের

কোনো সমস্যার আলোচনা করতে তারা নারাজ। ঘরোয়া কথাবার্তা খানিকক্ষণ চলতে পারে, কিন্তু নিজের দেশের কোনো সমস্যা নিয়ে বিদেশীর সঙ্গে আলোচনা করার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। বহু বিষয়ে আমেরিকান এবং রুশদের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে। সে-বিষয়ে আলোচনা পরে করব। কিন্তু দিলখোলা কথাবার্তায় দু-দেশের লোকের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আমেরিকার মানুষ দু-দণ্ডের পরিচয়ের পরেই মনের গোপনতম কথা বলতে চায়, নিজের দেশের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, দোষদুটির নিন্দাও দরাজ গলায় করে। প্রেসিডেণ্ট থেকে আরম্ভ করে শহরের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির নিন্দা বা প্রশংসা যা মনে আসে মন খুলে বলে যায়। কেবল স্বদেশ বলে নয়, বিদেশ সম্বন্ধে মতামত জাহির করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এ-ধরনের বন্ধনহীন আলোচনায় অন্য দেশের লোক সময়-সময় বিস্মিত হয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিরক্তও হয়। মস্কোতে ঠিক তার বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় মেলে। রুশ নাগরিক দেশের গুণগান খানিকটা করে, কিন্তু সমালোচনার কথা একটিও বলবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মত-বিভেদ প্রবল বা তীব্র হতে পারে, হয় সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে চলবে, তা নইলে পুঁথির বাঁধা গত আউড়ে যাবে।

প্রায় সমস্ত আলাপ-আলোচনাই তরজমার মাধ্যমে হয় বলে রুশদেশে সত্যিকারের মন খুলে কথা বলা আরো কঠিন। তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে এমনিতেই তেমন অন্তরঙ্গ আলাপ চলে না, দু-পক্ষই রয়েসয়ে কথা বলে এবং যা বলে তাও অনুবাদে এমনিতেই খানিকটা বদলে যায়। তার ওপর যারা তরজমা করে, তারা প্রায় সকলেই সরকারী চাকুরে। শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রেই তারা দলীয় মতবাদে গোঁড়া বিশ্বাসী। ফলে বিদেশী মন খুলে কথা বললেও যেসব কথা হয়, তা আলাপচারী রুশবাসীর কাছে পুরোপুরি পৌঁছায় না। পৌঁছলেও রুশবাসী তার উত্তরে যে-কথা বলে, তার অনেকখানিই তরজমাকারের মন জুগিয়ে বলতে হয়। ফলে বারবার দেখেছি যে অনেক সাধারণ সমস্যায়ও লোকে স্পষ্ট জবাব দিতে চায় না, প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। একমাত্র উচ্চতম রাজপ্রতিনিধিরাই খানিকটা স্পষ্টভাবে সাহসের সঙ্গে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারেন, বাকি লোকে কঠিন সমস্যারও হয় মামুলী উত্তর নয়তো ভাসাভাসা গোঁজামিল দিতে চায়।

আমাদের দলে রুশ ভাষা বেশ ভালো জানেন এমন একজন সঙ্গী ছিলেন। তাই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তরজমার ব্যতিক্রম আমরা ধরতে পেরেছি। তিনি নিজেও সাক্ষাৎভাবে রুশবাসীর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেখানেও দেখেছি যে যতক্ষণ ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের কথা নিয়ে আলাপ, ততক্ষণ খোলাখুলিভাবে আলাপ চলে। বাড়ি কোথায়, বাপ-মা বেঁচে আছেন তো, বিবাহ হয়েছে কিনা, ছেলেমেয়ে কয়টি, এসব প্রশ্নের আদানপ্রদান সহজ এবং অব্যাহত। কিন্তু দেশের লোকে যথেষ্ট খেতে-পরতে পায় কিনা, গত বিশ-পঁচিশ বছরে অবস্থার উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে, রাজনৈতিক দলাদলি আছে কিনা, এসব প্রশ্ন তোলাও বিপজ্জনক। আমরা অবিশ্যি রাজনৈতিক আলোচনা বেশি করি নি—সোভিয়েট রাষ্ট্রের শিক্ষা পদ্ধতির বিচার করতেই আমরা গিয়েছিলাম, কিন্তু তবু যদি প্রসঙ্গত কোনো রাজনীতি বা সমাজনীতির প্রশ্ন এসে পড়েছে, বেশির ভাগ লোকেই সে-সমস্ত প্রশ্ন এড়াবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি নিছক শিক্ষাসমস্যার আলোচনায়ও আমরা বার বার দেখেছি যে কোনো মূলগত প্রশ্নের সোজা উত্তর বেশির ভাগ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী দিতে চান না। স্কুলের ছেলেমেয়েরা যতখানি সাহসের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সে-তুলনায় অনেক বেশি হিসাব করে কথা বলে।

৩

আমরা যখন মস্কোয় পৌঁছলাম তখন রাত্রি প্রায় বারোটা-একটা। তা সত্ত্বেও আমাদের অভ্যর্থনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং এসেছিলেন, শিক্ষাদপ্তরের মান্যগণ্য আরো কয়েকজন কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। শুনেছি যে এমনিতেই রুশবাসী অতিথিবৎসল, আমরা ভারতবাসী বলে হয়তো সে-আতিথেয়তা আরো বেশি গভীর ও আন্তরিক হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে যে পাঁচ সপ্তাহ মস্কোতে ছিলাম, আমাদের সুখসুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল। যেভাবে তাঁরা আমাদের আদরযত্ন করেছেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

সেদিনে রাত্তিরে হাওয়াই আড্ডা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারি নি। পরে ফেরবার দিন সকালে অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখেছিলাম। বিরাট আড্ডা এবং নানাধরনের নানা হাওয়াই জাহাজ, কিন্তু যে-দালানে আমাদের সকলের অভ্যর্থনা ও বিদায়ের ব্যবস্থা, সে-দালানটিকে মামুলী বললে অন্যায় হবে না। বিমান-চলাচলের জন্য বৈজ্ঞানিক যে-সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তার কোনো-কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু লোকের চোখে ধাঁধা দেবার মতন তেমন কোনো অট্টালিকা বিমানঘাঁটিতে দেখি নি। সবই ব্যবহারিক প্রয়োজন দিয়ে যাচাই হয়েছে, খালি আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি কম। রুশ হাওয়াই জাহাজ সম্বন্ধেও সে-কথা বলা চলে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বা আমেরিকায় যাত্রীদের মনিবনোদনের জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা, রুশ হাওয়াই জাহাজে তার বিশেষ কোনো পরিচয় নেই, বরং বলা চলে যে সমস্ত ব্যবস্থাই মামুলী, কিন্তু বিমান-চলাচলের তাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। ইয়োরোপে আমেরিকায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নানা রকমের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা, গদি-আঁটা নানাধরনের বসবার আরামের সামগ্রী। রুশদেশে বিমানে খাদ্যপরিবেশনের ব্যবস্থা দেখি নি, সমস্ত খাওয়াদাওয়ার আয়োজন বিমান-আড্ডাতেই সম্পন্ন হয়েছে। বিমান সম্বন্ধে আর-একটা জিনিস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাধারণত বিমানপোতে আরোহীদের আসনের সঙ্গে যে পেটি থাকে এবং আরোহণ-অবতরণের সময় সমস্ত যাত্রীকেই সে-পেটি বাঁধতে হয়, রুশ-বিমানে তার কোনো নিশানাই দেখি নি।

মস্কো বিরাট শহর এবং দিন-দিন আরো বড় হয়ে উঠছে। কোনো-কোনো অঞ্চলে আকাশ-স্পর্শী অট্টালিকা নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্কাই-স্ক্রেপারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কোনো-কোনো অঞ্চলে এখনও একতলা-দোতলা কাঠের বাড়ি রয়েছে। তবে সর্বত্রই নতুন নির্মাণের নিদর্শন চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে সমস্ত শহরে এক বিরাট জীবনচাঞ্চল্য। পুরানো বাড়ির বদলে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা ভেঙে সিধে করে বিরাট সড়কের পত্তন হচ্ছে। পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন ইমারত গড়ে উঠছে, কিন্তু এখানেও আমেরিকার সঙ্গে মস্কোর একটা তফাত সহজেই ধরা পড়ে। আমেরিকায় পুরাতনের প্রতি বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই, পুরানোকে ভেঙে হরদম নতুন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুনকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের প্রতি আকর্ষণের পরিচয়ও সমান স্পষ্ট। নিউইয়র্কে দেখেছি যে দশবছর পূর্ণ হতে না-হতেই পুরানো দালান ভেঙে নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছে; কারণ নতুন ফ্যাশনের নতুন বাড়ি তৈরি করলে তাতে সুখসুবিধা বেশি থাকবে, রুজিও বেশি হবে। আমাদের দেশে সে-ধরনের বাড়ি ভাঙবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, ইয়োরোপেও বোধ হয় সে-ধরনের বাড়ি লোকে সহজে ভাঙবে না। মস্কোতে কিন্তু

পুরানো বাড়িকেও সযত্নে জিইয়ে রাখা হয়, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার জন্য দেদার অর্থ-ব্যয়েও রুশ রাষ্ট্র পরাঙ্মুখ নয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি পুরানো বাড়িকে আমূল কিভাবে একজায়গায় থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মস্কোর রাস্তাগুলিও দেখবার মতন। এমন প্রশস্ত ও বিরাট রাস্তা আর কোনো শহরে বোধ হয় এত বেশি নেই। প্যারিস সম্বন্ধে বলা হয় যে প্যারিসের রাস্তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। প্রায় একশো-দেড়শো বছর আগে নেপোলিয়নের আমলে নতুনভাবে প্যারিসের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। একশো বছর পরেও প্যারিসের রাস্তা আজও বর্তমান যুগের যানবাহনের ভার বইতে পারে। মস্কোর নতুন বড় সড়কগুলি বোধ হয় প্যারিসকেও হার মানায়। বস্তুত-পক্ষে রাস্তাগুলি এত বিরাট যে তার মধ্যে ব্যক্তি একা-একা চলতে সংকোচ বোধ করে। সমষ্টির মাহাত্ম্য এবং ব্যক্তির নিঃসহায়তা মস্কোর রাস্তায় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

মস্কো আটশো বছরের পুরানো শহর এবং সে-ঐতিহ্যের গর্ব ও গৌরব নানা দিকেই ছড়ানো; তবু গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে যেভাবে সমস্ত রুশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকাশ বদলাবার চেষ্টা হয়েছে, মস্কোর চেহারা দেখলেই তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। জারদের আমলে রুশদেশের যে চেহারা, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে। সে-চেহারা আজো একেবারে লুপ্ত হয়নি, কিন্তু যে-পরিবর্তন চল্লিশ বৎসরে ঘটেছে তার ফলে ইয়োরোপের অন্যতম অনগ্রসর রাষ্ট্র আজ বহুক্ষেত্রে পৃথিবীর অগ্রবর্তী দেশকেও ভাবিয়ে তুলেছে। কিভাবে এ-রূপান্তর সম্ভব হল সে-বিষয়ে মতভেদ আছে এবং থাকবে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এ-প্রগতিকে সাহায্য করেছে না ব্যাহত করেছে তা নিয়েও মতান্তর সম্ভব, কিন্তু একটি বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই। রুশদেশে শিক্ষা-প্রণালীর যে সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটেছে, রুশদেশের উন্নতির তাই যে প্রধানতম কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। শিক্ষার মাধ্যমে দেশের রূপান্তর কিভাবে হয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমেরিকায় মেলে। জার্মানীতে জাপানেও শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি সবদিকেই হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ ও ব্যবস্থায় রুশদেশে যে-রূপান্তর ঘটেছে, তা বোধ হয় আরো বিস্ময়কর। রুশ-প্রগতির বুনিয়াদ যে-শিক্ষাপ্রণালী আগামীবারে তার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করব।

কবিতা

কালান্তর

আনন্দ বাগচী

ফিরে আসবে বলেছিলে, হে আমার অনাদি কালের
ভ্রমর কৌটোয় ভরা রূপকথা, রুক্ষ কাঁটাজমি,
পথের পাতার জল, স্বপ্ন-বিহঙ্গম বিহঙ্গমী,
উঁচুনিচু ছাদরাস্তা, গ্যাসপোস্ট, ব্যর্থ বিকালের
হরতন-চিঁড়িতন, ফিরে আসবে বলেছিলে তাই
মোছেনি জলের দাগ, দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পাই।

সমস্তই ধ্রুবপদ, যাওয়া আসা গান্ধার রীতিতে;
ঘরে নাই এলে সখি, অনাগত বধূর মতন
কপালে সিঁদুর এঁকে, ভালোবাসা জানে ব্যথা দিতে।
গেরুয়াজ আকাশের মেঘে জ্বলবে শেষ বিস্মরণ
জন্মজন্মান্তর ঘুরে যদি তুমি ফিরে আসো দ্বারে,
হয়ত তখন আমি রূপকথার অর্বাচীন নট
কবে কার সুতানটী ডোবে কান্ত বিরহ কান্তারে,
কলকাতাকে মনে হয় ভুলে যাওয়া শতাব্দীর পট॥

অভীপ্সা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

একটি গানের স্বপ্ন দেখে সে সমস্ত রাত ধ'রে,
খোলা জানালার ফাঁকে বাসন্তী সখী হাওয়া তার
মুখ থেকে মুছে নেয় দিবসের অবসন্নতার
ক্লান্তির করুণ চিহ্ন, জ্যোৎস্না এসে আত্মীয় আদরে
অস্পর্শ চুমোয় তার প্রসন্ন ললাট দেয় ভ'রে,
দিনের রুক্ষতা শেষে হৃদয়ের আর্দ্র আকাঙ্ক্ষার
নীল ঘুমে থই-থই করে দুই চোখের কিনার,
সে যেন নিজেই স্বপ্ন ধ্যানশুভ্র তুলির আঁচড়ে।

একটি গানের স্বপ্ন দেখে সে সমস্ত রাত ভ'রে,
হয়তো সে গান আজো স্বপ্ন হ'য়ে আছে, শুয়ে আছে
আকাশের নক্সীকাঁথা গায়ে দিয়ে দিগন্তের কাছে,
হয়তো সে অন্ধকারে শিশির-শিশুরে বুকে ক'রে
নরম গন্ধের কোলে গা এলিয়ে ঘুমায় অঘোরে,
সে গানের গন্ধ এসে কোমল কুন্তলে তার নাচে,
আমার চেতনা মগ্ন সেই গন্ধে, হারায় তা পাছে
সে ভয়ে আমার চোখ জাগে তার চোখের শিয়রে।

একটি গানের স্বপ্ন দেখে সে সমস্ত রাত ধ'রে,
ছবির মতন তার মুখে সেই গানের আলোক
পদ্ম-পূর্ণিমার মতো ঝরে, আর সব দুঃখ-শোক
ভুলে যাই যে মুহূর্তে মুখে তার দৃষ্টি পড়ে ঝ'রে,
তবু ফের দুঃখ জাগে, সদ্যোবিধবার মতো ভোরে
স্বপ্নভাঙা ব্যর্থতায় বিদ্ধ হয় যদি তার চোখ
কী হবে তখন তার?
—না, না, তা হয় না, হ'লে হোক
অন্য কিছু—তা হবার আগে যেন আমি যাই ম'রে;

ম'রে যাব, কিন্তু যেন পারি তার আয়ুষ্মতী হাতে
তার সে স্বপ্নের গান তুলে দিয়ে মৃত্যুকে কাঁদাতে॥

অপাঙ্‌ক্তেয়

শামসুর রহমান

যেহেতু লৌকিকতার দড়িদড়া ছিঁড়ে বেপরোয়া
উঁচিয়ে মাস্তুল সুন্দরের ভাস্বর সে নীলিমায়
ভ্রমণবিলাসী তাই সম্মিলিত মুখর প্রস্তাবে
দিয়েছো উন্মাদ আখ্যা, উপরন্তু চিরশত্রু ভেবে
আমাকে করেছো বন্দী সন্দেহের অন্ধ ঊর্ণাজালে।

অথচ নারীর গর্ভে তমসায় নক্ষত্র-খচিত
আয়ুর অবোধ স্বপ্নে জন্মেছি আমিও, দন্তহীন
বাসনায় নিয়েছি অধীর মুখে স্তনাগ্র কোমল,
আর জুয়াড়ির মতো আপনাকে করেছি উজাড়
তীব্রতায় ধাতুর উজ্জ্বল মদে, ধুতুরার ঘ্রাণে।

মিথ্যাকে কখনো ভুলে সুন্দর ফুলের রমণীয়
স্তবকের মতো আমি পারিনি সাজাতে বঞ্চনায়,
বরং করিনি দ্বিধা কণ্ঠে তুলে নিতে আজীবন
সত্যের গরল। ফলত সে উন্নিদ্র তৃতীয় চোখ
অন্ধের বিমূঢ় রাজ্যে বাধ সাধে ব'লে ক্রোধ জ্বলে

বারবার আত্মতৃপ্ত এই অন্ধ কূপের গভীরে।
নেকড়ের মতো সব মানুষের দগল এড়িয়ে,
মাংসের মূঢ়তা ছেড়ে নৈঃসঙ্গে সম্পন্ন হ'য়ে চলি :
উদ্যত তামার মতো শরীরের পৌত্তলিক যেন
অর্পিত, গ্রথিত প্রাণ ভীষণের আগ্নেয় মালায়।

জীবনকে সহজ নিয়মে নেয়া যেত প্রথামতো,
কিন্তু তবু জ্যামিতির নেপথ্যে মায়াবী গুঞ্জরণে
মজেছি স্বতই দুঃখে অর্থ থেকে অর্থহীনতায়।
কুৎসার ধারিনি ধার, বরঞ্চ নিজেরই আচরণে
বিপন্ন হ'য়েও শুধু সারাক্ষণ অস্তিত্বের ধার

রেখেছি প্রখর তীক্ষ্ণ আর ব্যালে নর্তকের মতো
চেয়েছি গতির ধ্যানে অনন্তের একটি মাধবী
উন্মোচিত আবর্তিত হৃদয়ের হলুদ আকাশে।

অথচ নিশ্চিত জানি জীবনের সুকান্ত আপেল
অলক্ষিতে রক্তিম চাঁদের মতো ঝরে সুনিপুণ

কীটের সুখাদ্য হবে যথারীতি। মাঝে-মাঝে তবু
নিজের ঘরের ছিদ্রে চোখ রেখে দেখি পৃথিবীকে,
যেমন বিকারী দেখে যুগলের মদির নগ্নতা,
কামকলা, অবসাদ, নিদ্রায় মধুর শিউরনো।
তোমরা সজ্জন সহৃদয়, বলি হৃদয়ের স্বরে :

আমাকে গ্রহণ করো তোমাদের নিকানো উঠোনে
নারী আর শিশুর ছায়ায় আঁকা, রক্তকরবীতে।
আমার জীবনে নেই তৃপ্তির গৌরব, আর আমি
অর্থ খুঁজি চক্রে চক্রে, সমর্পিত মহাশূন্যতায়।

কী অর্থ নিহিত তবে নিপতিত গাছের পাতায়?

আশ্চর্যের দিকে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

সে হয়তো থেকেও নেই এই ক্লান্ত প্রতীক্ষার ঘরে।

অথবা দুচোখ তার দূরের পাখি;
ঘরের মসৃণ শান, বারান্দার বিষণ্ণ রেলিঙে,
রৌদ্রকে রক্তেরও চেয়ে প্রজ্বলিত জেনে আজ সেও
নির্জন ভালোবাসায় ছায়া হয়ে কাঁপে।
দ্যাখো তার প্রতিবিম্ব ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে;
সে নেই, থেকেও নেই; বলে এক সবুজ বাগান।
ধুলোপায়ে হাটে যায় সংসারী পথিক,
সে বলে, ছিলাম জানি, আজ নেই; কিন্তু তবু মানি
সুখদুঃখ সবই এই তর্জনীর এদিক ওদিক!

দেখার আলোয় ঘর ভ'রে ওঠে। বাহিরে তখন
সুদূরের ম্লান দৃশ্য শুকনো পল্লবের মতো ঝরে,
এবং যা কিছু জীর্ণ স্থিতির প্রতীক
সেই সব নিভৃতিকে আলোয় উড়িয়ে
তুমি পাখি ছায়া হয়ে থামো!
যেখানে ঝর্নার শব্দ, পাহাড়ের গম্ভীর পৌরুষ
আলোর আড়াল দিয়ে মগ্ন রাখে সোনার হরিণ,
পতঙ্গ সেখানে যায় সকলের আগে;
তুমি কিন্তু সেখানে যেয়ো না!
ঐ দ্যাখো সুন্দর হয়ে আছে কতো সাজানো বাগান,
কতো পথ,
ঐ যে মেলার মতো সুদূরের রঙিন জটলা,
প্রশান্ত আকাশ, নীল দিগন্তের অনন্ত উৎসব,
তাকেও ছাড়িয়ে—দূরে—বহুদূরে পৃথিবীর যে-অন্তহীনতা;
পাখি, তুমি যাও সেই দৃশ্যের অতীতে।

সে আজ থেকেও নেই এই একা প্রতীক্ষার ঘরে॥

মার্ক্স, সার্ত্র, শ্রীমতী বোভোয়া

অশোক মিত্র

কিছুদিন আগে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন জাঁ-পল সার্ত্রের সঙ্গে একটি বেতার-আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সার্ত্র অধুনা তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন, প্রসঙ্গ সে-প্রশ্নানভূমি থেকে শুরু ক'রে সমকালীন রাজনীতি-দর্শন-সাহিত্যের অনেকগুলি প্রান্তর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসে, যা বিশেষ ক'রে চমক লাগিয়ে দেয় তা সার্ত্রের বার-বার ক'রে পুনরুক্ত প্রত্যয় যে তিনিও মার্ক্সপন্থী।

যাঁরা ১৯৫৩ সালের ভিয়েনা শান্তি সম্মেলনের সময় থেকেই সার্ত্র সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছেন, তাঁদের মনে অবশ্যই বিস্ময়ের প্রবাহ বইবে না। বরঞ্চ, আলতো বিশ্লেষণে তাঁদের কাছে এটাই মনে হবে, হঙ্গেরীর ব্যাপার নিয়ে হুল্লোড়-বাধানো সার্ত্রের পক্ষে নতুন ক'রে পথজিজ্ঞাসার ইঙ্গিত নয়—পিকাসো এবং আরাগঁ-ও তো সে-গলাবাজিতে ক্ষীণপ্রমে যোগ দিয়েছিলেন—নেহাৎই সাময়িক সচেতনতাস্খলন; লাভক্ষতির বিচার ক'রে সার্ত্র এখন ফের কমিউনিজমের গহন মৃত্যুপিপাসার মাদকতায় ডুবে-যাওয়ার সুযোগ খুঁজছেন।

তন্নিষ্ঠমন এই সরল উপাখ্যানে সায় দেবে না। *L'Existentialisme et un humanisme*-এর পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত সাভিলের সঙ্গে সার্ত্রের বিতর্কের মূল সূত্রগুলো মনে আনলে তাঁর সাম্প্রতিকতম উক্তিকে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার কাঠামোয় যুক্তিশূন্য ক'রে নেওয়ার চেষ্টা বিপরীত ধোঁকার সৃষ্টি করবে মাত্র। যদিও Les Mains Sales-এর অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে তিনি রাজি হয়েছিলেন, সৃজনের সমস্ত ইতিহাসকে তাহলেও ইচ্ছার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না; সার্ত্রের চিন্তার সাক্ষ্য বহন ক'রে আছে তাঁর পুঞ্জিত রচনাবলী, গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-বিতর্ক, *Les Temps Modernes*-এর পুরনো-সব সংখ্যা। যদি এমনও মেনে নেওয়া হয় যে ইতরজনদের কাণাঘুষোই ঠিক, দার্শনিক সার্ত্র সম্পত্তি রাজনীতির বিষাক্ত বিবিক্ত সমুদ্রে আত্মহত্যায় উন্মত্ত, সে-ক্ষেত্রেও এ-আপাতবিকারের কারণ খুঁজতে হবে, এবং তার জন্য সার্ত্রের রচনার পর্যালোচনাই শ্রেয়স্কর পথ।

তবে কি অস্তিত্ববাদের প্রথম স্ফুরণ থেকেই মার্ক্সীয় চিন্তার রাহু ছায়া ফেলে আছে? কোন্ সূত্রের স্বল্পতম নির্ভরে সে-সেতুবন্ধন যা আজ সার্ত্রকে ঘোষণা করতে বাধ্য করায় যে মার্ক্সকে ছাড়িয়ে কোনো ভাষ্য নেই, বিচার নেই, যুক্তিগঠন নেই? তাঁর প্রধান দর্শন প্রণয়ন *L' Etre et le Néant*-এর সদ্যপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ *Being and Nothingness*[1] সার্ত্রীয় দর্শনের বিশদ পুনর্বিশ্লেষণের চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।

সত্তাই অস্তি, সত্তার বাইরে কেবলই শূন্যতা : অস্তিত্ববাদের মূল কথা, অন্তত হিদেগারের ধারার ঐতিহ্য বহন ক'রে সার্ত্রীয় দর্শনে যা সংশ্লিত হয়েছে, এই প্রাথমিক অনুশাসনের শরীর আশ্রয় ক'রে। আমি আছি, আমি স্বয়ম্ভু, আমার বাইরে যা-যা, তা আমার সত্তার স্ফুরণের পক্ষে অকেজো, অবান্তর। আমার বর্তমান আমার অতীতের প্রতিফলন, আমার ভবিষ্যৎ আমার বর্তমানের কল্পনা-যোজনা-জিজ্ঞাসার সংশ্লেষণ থেকেই জাত

[1] Translated *by* Hazel E. Barnes. Methuen & Co., London. *50s.*

হবে। আমার সত্তা একা, আমার সত্তা শূন্যতার মধ্যে একটি দ্বীপ, বাইরের হাওয়া তাকে আন্দোলিত করতে পারে না, বাইরের আবেগ তাকে মহাদেশ কিংবা মহাসমুদ্রের সন্ধান দিতে পারে না, কোনো চিন্তার বিদ্যুৎ আমার সত্তাকে শিহরিত করবে না, কলুষিত করবে না। আমার সত্তা অজেয়, আমার সত্তা বহির্প্রকৃতির অভিভাবের বাইরে।

তা-ই যদি হয়, সত্তার কোনো সহকার থাকতে পারে না। সমাজ, দেশ, সখ্যতা, এ-সমস্তই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত শৃঙ্খল, কিন্তু জীবনের নিয়ামক নয়। মানবিক অনুশাসন মিথ্যে, সামাজিক সংজ্ঞাদি অলীক, এমনকি বন্ধুতার আনুগত্য পর্যন্ত সত্তার খেয়ালখুশির উপর। সত্তা থেকে সত্তান্তরে, অস্তিত্ব থেকে অন্য-এক অস্তিত্বে, এক বিশেষ অবস্থা থেকে অন্য-এক অবস্থার আবহে অহরহ আমার অভিযাত্রা, কিন্তু তাতে বাইরের কোনো অঙ্গুলিহেলন নেই। সিদ্ধান্তগুলি আমার, অঙ্কুর থেকে উদ্গম, উদ্গম থেকে বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর বিকাশ : অস্তিত্বের প্রতি ধাপেই আমি চিন্তা করছি, ব্যক্ত করছি, গঠন করছি, ভাঙছি, নিজেকে স্খলনে ভাসাচ্ছি, আগুনে পোড়াচ্ছি। যে-কোনো মুহূর্তে আমি আমার গতি বদলে দিতে পারি, ব্যক্তিগত পরিসংখ্যানে বিপ্লব আনতে পারি, প্রথাকে উপহাসে মিলিয়ে দিতে পারি।

বলা হবে, এ তো নৈরাজ্যের ভাষণ, অণুর বিবৃতি। মার্ক্সীয় দর্শনের সারসত্য সমষ্টি, অণু-উপনিষদের খণ্ডন। মার্ক্স যেখানে পুঞ্জ ও সংহতি নিয়ে ন্যায় প্রণয়ন করেছেন, সার্ত্র সেখানে ভগ্নাংশবিলাসিতায় মগ্ন। সার্ত্রীয় দর্শনের মূল বিভক্তি সমষ্টিকে অস্বীকার, অতএব মার্ক্সের পুরোপুরি প্রতীপ। এ-দুই প্রত্যন্ত চিন্তার মধ্যে তাহলে সাযুজ্যের সুযোগ কোথায়, সামান্যতম সৌষম্য খুঁজে পাওয়াও তো সম্ভবপরতার অন্য পারে?

কিন্তু না-হয় আরেকটু ভেবে দেখা যাক। বিভক্তির প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রাখলে, সার্ত্রের চিন্তাবিন্যাসও ভূতচৈতন্যবাদকে আশ্রয় ক'রে। যুক্তির যে-চূড়ান্ত সরলীকরণ মার্ক্সীয় অন্বীক্ষায় আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, সার্ত্রেও তার স্পষ্ট আভাস বর্তমান। তাছাড়া, মার্ক্সের কাঠামোতেও বহির্প্রকৃতির জায়গা নেই। সমাজ বিবর্তিত হয়, এক পরিষঙ্গ থেকে পরবর্তী প্রশ্থানে এগিয়ে চলে নিজের তাগিদে, অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের পীড়নে। প্রকৃতি-পুরুষ কাহিনী সমাজের ক্ষেত্রেও উহ্য, উপমান-উপমেয় দিয়ে অলঙ্করণ করতে হ'লে বলতে হয় সমাজই পুরুষ, সমাজই প্রকৃতি। সমাজে ক্লেশের সংকট আছে, আত্মজিজ্ঞাসার আর্তনাদও অনুপস্থিত নয় : পুঞ্জে-পুঞ্জে ক'রে শক্তি-প্রতিশক্তির বিরোধ শীর্ষের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অতঃপর একদিন বিস্ফোরণ হ'য়ে দেখা দেয়। তার ফলে সমাজ এক স্তর থেকে নতুন-আরেক স্তরসন্ধিতে ভারসাম্য আবিষ্কার করে। সমাজের এই অহরহ চিত্তশুদ্ধিতে অথচ বিধাতার ভূমিকা নেই, অন্য-কোনো বহিঃশক্তির প্ররোচনা নেই। সার্ত্রের সত্তার মতো, সমাজও স্বয়ম্ভু। মার্ক্সীয় সংস্থার প্রধান চমৎকারিতাই হলো এই অন্বীক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কাঠামো তথা বস্তুর সারাৎসারে অস্তিত্ববাদের লক্ষণাদিও অনুরূপ।

এই সমান্তরালতা উপেক্ষণীয় নয়। নিছক ন্যায়ের দিক থেকে দেখলে মেনে না-হ'য়েই পারে না মার্ক্সীয় দর্শনের প্রজ্ঞাটুকু নিয়ে কেউ যেন অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন, হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে টুকরো-টুকরো চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে গেল তা, সার্ত্র তার একটি কুড়িয়ে নিলেন। অখণ্ডর চেতনায় যে-প্রক্রিয়া কাজ করছিলো, অণুখণ্ডেও তা থেকে খিরাচরণ হলো না। কিন্তু সত্তার পরিধি ছোটো হয়ে এলো এবার, সমষ্টির শপথ বর্জন ক'রে দর্শন ব্যক্তির ভর পেলো। যা ছিলো সমাজবিবর্তনের একচ্ছত্র বিজয়ী কাহিনী, কী রকম সংকীর্ণ বিশীর্ণ হয়ে এলো তার রূপকল্প-পটভূমি-পরিসর, সত্তা তার লোকাতীত

এককথায় স্তম্ভিত হয়ে এলো।

সার্ত্রীয় দর্শনে সংকট তাই প্রায় প্রথম থেকেই অপ্রতিরোধ্য। দুটো যথেষ্ট ভিন্ন কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মনে হয় প্রায় প্রত্যেক দর্শনই কিছু পরিমাণে জাতিস্মর। সার্ত্রীয় প্রজ্ঞার পক্ষেও শেষ পর্যন্ত মার্ক্সীয় অন্বীক্ষার জন্মক্ষণ শোধ না-ক'রে উপায় নেই। অথচ অন্য পক্ষে সত্তা ও চিন্তার ধর্মই হলো প্রান্তন অধিস্থান সম্বন্ধে গ্লানি-বোধ, ঐতিহ্যকে অস্বীকার। কিছুটা গ্রীক চিন্তার প্রলেপ লাগিয়ে এটাও বলা চলে, যে-অখণ্ড দর্শনের ভূমণ্ডল থেকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে অস্তিত্ববাদের স্বতন্ত্র স্ফুরণ, তার প্রসঙ্গে কর্ণসুলভ একটি অনীহা গড়ে ওঠাও বিচিত্র ব্যাপার নয়। মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে সার্ত্রের রচনাবলীতে তাই জায়গায়-জায়গায় দ্বিধা, অস্থিরতা, এমনকি স্ববিরোধিতা পর্যন্ত পরিকীর্ণ হয়ে আছে : এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে অস্তিত্ববাদের মুক্তির আশা পরাহত। উপরিলিখিত বেতার-আলোচনায় সার্ত্রের স্বীকৃতি—মার্ক্সের সংস্থা থেকে পশ্চাদপসরণ অসম্ভব'—তাই সাময়িক বিভ্রম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রেরণাসঞ্জাতও নয়, বরঞ্চ পরিপক্ক উপলব্ধিরই বিবেকদংশন।

সংকটের অন্য কারণের জন্য আরো জটিলে প্রবেশ করতে হয়। এখানেও অবশ্য জন্মের প্রসঙ্গের মধ্যেই সমস্যার গ্রন্থিগুলি বিধৃত হয়ে আছে। যেহেতু মার্ক্সের চিন্তা সমাজ-সমষ্টি নিয়ে বিস্তার পেয়েছিলো, তাতে কোনো জায়গাতেই নৈরাশ্য বা সর্বনাশের দ্যোতনা ছায়া ফেলেনি। সমাজে ঘুণ ধরবে, বিরোধী শক্তিতে সংঘর্ষ বাধবে, গুঁড়ো হয়ে যাবে পুরনো কাঠামো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক মানুষ নতুন স্তরে উঠে যাবে, মহত্তর সমাজের সৃষ্টি হবে, প্রগতির রথঘর্ঘর বন্ধ হবে না। সমাজের চিত্তশুদ্ধি ক্ষণিকের আবেগ নয়, তা চিরন্তন অন্তঃপ্রবণতা; মানুষের, সমাজের অপ্রতিহত মহত্ত্বসিদ্ধির প্রয়াসও অতএব এক শেষহীন অভিযাত্রা। মানুষের সিদ্ধির শেষ নেই, মহত্ত্বের শেষ নেই : মার্ক্সীয় দর্শনের এটাই প্রধান, পরম বাণী।

সার্ত্রীয় সংস্থানে পৌঁছুলে অনুশাসন-অধিকরণ সব-কিছু চূড়ান্ত বদলে যায়। শুধু তার নিজের সত্তা নিয়ে মানুষ একা; সে নির্জন, একাকী একদিকে, অন্য পারে পৃথিবীর অন্য-সমস্ত মানুষ, অন্য-সমস্ত মানুষের সত্তা, দেহ। নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকাই তার দায়িত্ব, অন্য সমস্ত-কিছু উপেক্ষা ক'রে। নিজের সত্তার নির্ভরে দাঁড়িয়ে সে-ও প্রগতি খোঁজে। কী সেই প্রগতির প্রকৃতি, সত্তা তার একাকিত্ব নিয়ে কী জয় করবে, নবতর কোন্ উপনিবেশে নিজেকে বিস্তার করবে? আমার চেতনা, আমার দেহ : সত্তার মাত্র এই দুই অস্ত্র, দুই মধ্যবর্তিতা। কিছুদূর পর্যন্ত আমার চেতনাকে আমি শোধিত, শাণিত ক'রে তুলতে পারি। কিন্তু, আমার একাকিত্বের প্রেক্ষিতে, সে-চেষ্টায় একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার চেতনাকে যদি আরো শালীন ও উন্নত করতে চাই, অন্য সত্তার গহনে আমাকে প্রবেশ করতে হবে, অন্য চেতনাকে পরাভূত ক'রে আমার চেতনার প্রয়োজনে লাগাতে হবে। তেমনি, আমার নিজের দেহের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হ'লে অন্য দেহের অভিজ্ঞানে অবগাহিত হ'তে হবে, দেহ থেকে দেহান্তরে উত্তাপের সিন্ধতা অন্বেষণ করতে হবে।

কিন্তু ঠিক এখানেই অস্তিত্ববাদের প্রচণ্ড পরাভব। কারণ হাজার চেষ্টা করলেও অন্যের সত্তা আমার হবার নয়, অন্যের চেতনা আমার অভিজ্ঞানের বাইরে। কিছুদূর এগিয়ে তাই প্রতিহত হয়ে ফিরতে হয়, সামনে নিশ্ছিদ্র গুহার অন্ধকারে। তাছাড়া দেহের মধ্য-

বর্তিতায় আত্মবিস্তারের প্রয়াসও অসফল হতে বাধ্য; যেখানে দেহের অভিজ্ঞতায় চেতনার সমাস নেই, সত্তার উত্তাপ সেখান থেকে অবশ্যই অনুপস্থিত। দেহের পর দেহে বিহার ক'রে-ক'রে শেষ পর্যন্ত তাই অভিভূত অবসাদ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

সুতরাং অস্তিত্ববাদের অন্তিম মুক্তি ব্যর্থতাবোধে, হতাশার খিন্নতায়। তার সত্তা নিয়ে, সত্তাভরা সাহস নিয়ে মানুষ পৃথিবীর পথে এসে দাঁড়ায়, পৃথিবীজয়ের, প্রকৃতিজয়ের বাসনায় ছাওয়া। সে সৃষ্টি করতে চায়, নিজেকে উন্নততর কোনো সোপানে উত্তীর্ণ করতে চায়; সত্তা থেকে সত্তান্তরে, চেতনা থেকে চেতনান্তরে, দেহ থেকে দেহান্তরে তার তৃষ্ণা। কিন্তু যে একাকিত্ব তার গর্ব ছিলো, তা-ই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তার চেষ্টার ত্রুটি নেই, লক্ষ্য তার কাছে মরীচিকাপ্রতিম হয়েই থাকবে। বড় জোর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ভাষায় আমরা বলতে পারি 'রাহুগ্রস্থ হলেও, সে আমাদের নমস্য', কিন্তু সে-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সত্তার প্রভূত আত্মধিক্কার কাটবে না।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সার্ত্রের নিজের এবং সার্ত্র-প্রভাবিত অন্যান্য লেখকদের কাহিনীবিন্যাসে যৌনসম্পর্ক ও সংগম-প্রক্রিয়ার প্রলম্বিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বিকার-প্রিয়তা থেকে উদ্ভূত নয়, তার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। চেতনার বহির্বিজয়ের গন্ডি যেখানে নিষ্ঠুররকম সংক্ষিপ্ত, একমাত্র দেহের সাহায্যেই সে-অবস্থায় সত্তার ভূপর্যটন সম্ভব। সুতরাং এ-পর্যটনের বর্ণনায় কৃপণতা বারণ। শুধু দেহ দিয়েই যতটুকু সম্ভব নিজেকে বিস্তার করতে পারছি আমি, এ-ই আমার সৃষ্টি, এ-ই আমার মহত্ত্বের ভূমিকা; অতএব আমাকে বিস্তার করে বলতে দাও, বাধা দিও না। এ আমার ক্ষণিকজয়ের, ক্ষণিকজয়ের কাহিনী; যে-কাহিনী শেষ হয়ে গেলে ফের শূন্যতা, এমনকি যে-কাহিনীরও পরিশেষে সেই একই শূন্যতায়।

সন্দেহ হয়, সার্ত্র ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসরণকারীদের কাছে অস্তিত্ববাদের অন্তিম কুয়াশা বহুদিন থেকেই উৎকীর্ণ জিজ্ঞাসারূপে উপস্থিত হয়েছে। তাহলে কি সত্তার ঘোষণা, এককত্বের তূর্য নিনাদ শেষ পর্যন্ত শুধু নেতির তমিস্রাতেই পৌঁছে দিতে সক্ষম? সৃষ্টির অন্য কোনো রূপবিভঙ্গ নেই, ইতিহাস অথবা সমাজবিজ্ঞানের নতুন কোনো সম্ভাবনা নেই? এই যে নতুন দর্শন, সত্তার সংস্থানে যার গর্ব, তাকে তো ফলিত বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজসংস্থা, মানবিক সম্পর্কের সর্ববিধ প্রসঙ্গ, অস্তিত্ববাদের প্রস্থানে এদের যদি আলাদা রূপ না-দেয়া যায়, তাহলে তো সে-দর্শন ব্যবহারিক অর্থেই ব্যর্থ হয়ে গেল।

অস্তিত্ববাদীরা কোন্ দিকে মুখ ফেরাবেন তাহলে? তাঁদের আহৃত প্রজ্ঞায় পথনির্দেশ নেই, অন্তত যেটুকু আছে তা আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমাজকে অবহেলা করে কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব, রাজনীতির নির্ঘোষও মুখোমুখি প্রত্যাক্ষতা। সত্তার নিঃসঙ্গ অঙ্গন থেকে বেরিয়ে সমষ্টির সীমান্তে এসে হাত মেলাতেই হবে, একাকিত্বের বিপন্ন পিপাসা অন্যথা মেটবার নয়। আত্মদর্শনে যদি মুক্তির সন্ধান নেই, বাধা হয়েই অন্য অনুসৃতি খুঁজতে হয় তখন। অস্তিত্ববাদীরা অবশ্য এ-ধরনের সমর্পণকে চরম বলে মনে করবেন না, শুধু বলবেন ভগ্নাংশিক বোঝাপড়া। কিন্তু বিশ্লেষণে কী-ই বা এসে যায় : এ-সত্য থেকে পলায়নের উপায় নেই যে অস্তিত্ববাদ এক স্তম্ভিত উপত্যকায় এসে উপনীত হয়েছে, এখান থেকে কোন্ দিকে ফের উদ্দাম হওয়া সমীচীন, তা নিয়ে আপাতত অনেকরকম কলরোল, একদা-সহযাত্রীদের বহুধা বিভাগ।

সার্ত্র ও ক্যাম্‌-র পথ পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণও এই সংকটের আবর্ত। রাজনীতির ক্ষেত্রে সার্ত্র যে-জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দিঙ্‌নির্দেশ কয়েক বছর আগে মেনে নিয়েছিলেন, ক্যাম্‌-ও অনুরূপ বিশ্লেষণ করে দক্ষিণচক্রে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। হয়তো এমন বললে অপভাষণ হবে না যে অস্তিত্ববাদের প্রধান দুই পুরোহিত যে পারস্পরিক মতামত-পরিপন্থী দুই রাজনৈতিক সংস্থার ছায়াশ্রয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন সেটা যত বিস্ময়ের, তার চেয়েও অনেক বড় প্রশ্নদ্যোতক এ-ব্যাপার যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁদের নিতেই হলো। সার্ত্র আরাগঁ-র পাশে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসছেন, এটাই যাঁদের প্রধান দুঃখ, তাঁরা অস্তিত্ববাদের গভীরতর সংকটের সারমর্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

শ্রীমতী সীমন দ্য বোভোয়ার ছ'শো পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস *The Mandarins*[2] অস্তিত্ববাদের অন্তর্লীন উতরোলের আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বহন করছে। স্থান পারী, কাল আজ থেকে বছর দশেক আগেকার পটভূমিকা, মঁসিয়ে তোরেজকে সবেমাত্র মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে—কি হয়নি—, পাত্রপাত্রীরা প্রায় অধিকাংশই সাহিত্য-রাজনীতির সদর-অন্দর প্রব্রজ্যা করে থাকে। দার্শনিক দন্ত্রই ও সাহিত্যিক আঁরি, দন্ত্রইয়ের উপন্যাস-লেখিকা স্ত্রী এ্যান, কন্যা নাদিন যে যুদ্ধের মধ্যে কিশোর বয়সের প্রেমিককে হারিয়ে এখন সে-জ্বালার প্রতিষেধক হিসেবে পুরুষ হ'তে পুরুষান্তরে গমন করতে ভালোবাসে, আঁরির পুরোনো প্রেমিকা পলা যে আঁরির অস্তিত্ব নিজের সত্তার মধ্যে পুরোপুরি ভরে রাখতে চায়। আরো অনেক চরিত্রের আসা-যাওয়া, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ। সাধারণ উপন্যাস হলে সম্ভবত এত ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠবার উপক্রম হতো, কিন্তু শ্রীমতী বোভোয়ার বই নিমগ্নতায় আঁকড়ে ধরে, এমনকি ক্বচিৎ অনামনস্কতা পর্যন্ত অপরা প্রসঙ্গ বলে মনে হয়।

উপাখ্যান অংশ সবিস্তারে বিবৃত করার বিশেষ সার্থকতা নেই, কারণ কাহিনীর ভূমিকা দৃষ্টান্তের পরিধিতে সীমিত, কখনোই প্রধান নয়। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নীতি, প্রচিন্তা, যুক্তি-সংস্থা যে সব বৃত্তিকে অক্ষৌহিণী বলে অস্তিত্ববাদীরা বিবেচনা করে থাকেন, তাদের সাহায্য নিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত হয়তো পরিশুদ্ধ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একদিন-না-একদিন শ্রান্তির ঢল নামবেই। দন্ত্রই ও আঁরিতে মিলে রাজনীতি-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সম্প্রদায় এদিক-ওদিক কোথাও বোঝাপড়ার তাগিদ। আঁরির পত্রিকা *l' Espoir*-ও ঠিক সে-কারণেই গঠনের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত স্ফুৎকারে মিলালো। মার্ক্সবাদের সামাজিক অনুশাসনগুলি মানা হবে, অথচ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বস্বীকার্য নয়, এই দ্বৈত সিদ্ধান্তের অস্তিত্ববাদী অঙ্গীকার বাইরের চাপ সহ্য করতে পারার মতো নিজস্ব শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। ফলে ডাইনে-বাঁয়ে দুদিক থেকেই চাপ আসে, চাতুরী ও হঠকারিতার প্রলোভন, নির্বাপিত হয়ে এলো : সত্তা তার নিঃসঙ্গতা নিয়ে বহুবল্লভ হয়ে উঠতে পারে না, তার সংস্থার সন্ধানও তাই অসফল হতে বাধ্য। নিজের সত্তা খানিক বিনিময় না করলে অন্যরা তাদের সত্তা আমার অধীনে গচ্ছিত রাখতে রাজি হবে না : অথচ আমার দর্শন আমাকে এ-বিনিময়ের অনুশাসন শেখায় নি, অতএব ব্যর্থতার হাত থেকে নিস্তার নেই।

সবাইকেই প্রতিহত হয়ে আসতে হয়। পলা শুধু আঁরির সত্তা নিংড়ে-নিংড়ে পেতে চেয়েছিলো, নিজের মনে আকাশকুসুম রচনা করে ভেবেছিলো তার নিজের সত্তায় আঁরির সত্তা

[2] Translated by Leonard M. Friedman. World Publishing Company, Cleveland and New York. $5.

পুরে ফেলতে পারবে, দুই অস্তিত্বকে এক করে দেবে সে। করুণরকম ব্যর্থ হলো সে কারণ আঁরির সত্তা পরাভূত হতে রাজি নয়, অহরহ বহুগমনে বরঞ্চ সে আশ্বস্ত হতে চায়, নিজেকে বোঝাতে চায় এখনো সে নিজের নিয়তি। অন্যপক্ষে পলাও যেদিন বুঝে নিলো আঁরির সত্তা সদ্‌পরাহত, নিঃশেষে সে-স্মৃতি মুছে ফেললো চেতনা থেকে; যার আর-কোনো সম্বল নেই, সে শুধু নিজের সত্তাটুকু নিয়ে নিভৃত হয়ে রইলো।

ব্যর্থতা আঁরিরও। পত্রিকাচালনা ও রাজনীতির কথা ছেড়ে দিলেও, আরো নানা ক্ষুদ্রতর পরিসরে তাকে রক্তের ইঙ্গিতের বাইরে বোঝাপড়া করতে হয়। কোনো-একদিকে স্বাধীনতা ব্যক্ত করতে গেলে অন্য এক কোণ থেকে টান পড়ে, পত্রিকার আয়ু বাড়াবার প্রয়োজনে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে হয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসের চাপে পড়ে শঠতার সঙ্গ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই, বাৎসল্যের বশে বিবেকবিরোধী পাপ ক্ষমা করে যেতে হয়। সত্তার বিভিন্ন বশ্যতার মধ্যে সংঘাত প্রতি মুহূর্তে চেতনাকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিচ্ছে, এ-প্রতিদ্বন্দ্বে কোন্ পক্ষে তাহলে তার অঙ্গীকার, স্বাধীনতার স্বরূপ তাহলে কী? যদি বলা হয় প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, তাহলে কোনোক্রমে জোড়াতালি দিয়ে দর্শনের অন্তর্নিহিত মর্ম বজায় রয়েছে সে-দাবি করা চলে অবশ্য, কিন্তু চিত্তশান্তি হয় কি? নাদিনকে বিয়ে করে গার্হস্থ্যে নেমে আসার সিদ্ধান্তটি বড়, না কি তার আগেকার অবিচলিত মনোভাবই সত্য?

অথবা এ্যানের কথাও ধরা যেতে পারে। মহীরুহের মতো উদার স্বামী, এ্যানের রক্তে তবু চঞ্চলতা, নিজের সত্তার উপর তার অধিকার অখণ্ড আছে মাত্র এটুকু প্রমাণ করবার জন্যে ক্ষিয়াসিনের সঙ্গে হোটেলের ঘরে সংগম করে আসতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এই অস্থিরতার সংস্থানে নীড় ভাঙাই সম্ভব, নতুন করে গড়ে তোলা যায় না। সেজন্যই তার মার্কিন প্রেমিক পর্যন্ত, তার উত্তাল সম্মোহন সত্ত্বেও, এ্যানকে ধরে রাখতে পারলো না। ভয় দুদিকেই : সত্তাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয় এ্যান; তাছাড়া, যে-মুহূর্তে পারস্পরিক আবেগে সামান্য সংহতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সে-সংহতি সম্বন্ধেও তার আশঙ্কা, সে তো বহির্চক্রান্তে ধরা পড়ে যাচ্ছে না?

একমাত্র দন্ত্রই চরিত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অবৈকল্য বজায় আছে। এটা পিতৃ-প্রবণতার প্রতীক কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। তবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত-নিঃশেষিত হয়ে আঁরি, নাদিন, এ্যান সবাই-যে দন্ত্রয়ের আনুগত্যে ফিরে আসে, সে-প্রচ্ছন্ন সংকেতের আকর্ষণ কম নয়। রাজনীতিতে প্রতিহত হয়ে দন্ত্রইও তেমনি নিজের পড়ার ঘরের অখণ্ড শান্ততে ফিরে এসেছিলো। তবে কি অস্তিত্ববাদ, আঁরি-দন্ত্রইয়ের গোষ্ঠীগঠনের প্রয়াস, সত্তার শপথে বাহুমেলতে-চাওয়া ইত্যাকার আরো নানা আকৃতি, সব কিছুই একদিন শান্ত হয়ে আসবে, শ্রান্ত হয়ে আসবে? তারা তখন তাহলে সত্তার জীর্ণ জিজ্ঞাসাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফিরে যাবে মহীরুহের ছায়ায়, মার্ক্সীয় দর্শনের বিশাল সমুদ্রে, কমিউনিস্ট পার্টির মসৃণ সংশ্লেষণে? সত্তাকে যদি সৃষ্টিশীল হতে হয়, সমষ্টির সামগ্রিক প্রত্যয় মেনে নিয়েই তবে তাহলে?

শ্রীমতী বোভোয়ার উপন্যাসে এ-প্রশ্নের উত্থাপন আছে, স্পষ্ট মীমাংসা নেই। সার্ত্রের সাম্প্রতিক রচনাদিতেও আপাতত একই জিজ্ঞাসা। একক সত্তা ও সমাজচেতনার মধ্যে সেতু-যোজনার উৎকণ্ঠায় অস্তিত্ববাদের প্রহর কাটছে; ইতিমধ্যে হয়তো প্রবাহ আরো আরক্ত হবে।

নীল রাত্রি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সুকিয়া স্ট্রীটের কাছাকাছি আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর লাল রঙের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা হঠাৎ চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু তাহলেও চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড দুটো নিমগাছ এমনভাবে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে জায়গাটা সারাক্ষণ ছায়ায় ঢাকা থাকে। আর শোনা যায় পাখির অশ্রান্ত কিচিরমিচির। রৌদ্রক্লান্ত কোনো পথচারী পেভমেণ্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এখানে এসে পৌঁছলে ভাববে, আহা, এ যেন ঠাণ্ডার স্বর্গ! এবং তখন চোখ তুলে লাল রঙের দোতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে পথিক এ-কথাও ভাবতে পারে—বাড়ির সামনেটা যখন এমন ছায়াচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ, ভিতরটাও বুঝি তাই! হয়তো তাই। বাইরে থেকে কি আর তেমন বোঝা যায়। হ্যাঁ, এটা সত্য, বাইরে দুটো গাছের মাথায় সারাক্ষণ যেমন পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে, ডালে পাতায় ঠোঁট ঘসছে আর পাকা নিমফলের মদির গন্ধে দিশেহারা হয়ে শব্দে গানে আকাশ-বাতাস মুখর করে রাখছে, ভিতরটা, বাড়ির সমস্ত অন্তঃপুরটা যেন আবার তেমনি বড় বেশি চুপচাপ। অবশ্য নিচের তলার রাস্তার দিকের বড় দুখানা কামরা নিয়ে একটা ডিসপেন্সারী। সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত দরজা খোলা আছে। তাহলেও এখানে যে খুব বেশি লোক ওষুধপত্র কিনতে আসে তাও না। সুদর্শন চেহারা, অল্প বয়স, সুটে পরা চশমা-চোখে যে ভদ্রলোক ডিসপেন্সারীর একটা টেবিল আঁকড়ে সারাক্ষণ বসে আছেন তিনি এই ওষুধের দোকানের মালিক এবং পাশকরা ডাক্তার। দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা ছোট্ট একটুকরো কাঠের ওপর ইংরেজীতে লেখা রয়েছে Sudhansu Chakraborty, M.B. সুদর্শন হলেও ডাক্তারের চেহারা, চলতি কথায় যাকে বলে, কেমন যেন 'নিরামিষ গোছের'। যেমন গোটা বাড়িটা গম্ভীর তেমনি তিনিও গম্ভীর। হাসি নেই, কথা নেই। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বয়সের তুলনায় তাঁর চোখ দুটো একটু বেশি ক্লান্ত বিমর্ষ, সবসময় একটা অসহায় ভাব লেগে আছে চোখেমুখে। কারণ জানা যায় না। তবে এমনও হতে পারে নতুন পাশ করে বেরিয়েছেন, অভিজ্ঞতা কম, এখনও লোকের কাছে তেমনভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন না, সারাদিনে একটি কি দুটি রুগী যদি ডাক্তারের ব্যবস্থা বা পরামর্শ নিতে ডিসপেন্সারীতে আসে, বাইরের 'কল্' একেবারে নেই, এবং কবে কোনদিন পশার জমবে, নাকি এমনি কাটবে, আর যদি তাই হয় তাঁর পরামর্শ বা ব্যবস্থা ছাড়া বাইরের 'প্রেসক্রিপশান' নিয়ে তাঁর দোকানের ওষুধ কিনতে সাধারণ খদ্দেরের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়বে কিনা—এ-সব চিন্তায় তিনি এমন মনমরা হয়ে আছেন। কম্পাউণ্ডার বা অ্যাসিস্টেণ্ট বলতে তাঁর কেউ নেই। আছে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের একটা ছেলে। ঝাড়পোছ করে, বাইরের টিউবওয়েল বা রাস্তার ট্যাপ থেকে বালতি করে জল বয়ে এনে ডাক্তারের কুঁজো ভরে রাখে, ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের পাশে রবারের নল-পরানো ড্রামটা ভরে রাখে, দরকারমতো মোড়ের রেস্টুরেণ্ট থেকে ডাক্তারবাবুর জন্যে কি তাঁর কেউ বন্ধু এলে চা-টা ডিম-টা এনে দেয়, আর (দিনে একবার বড়জোর দুবার, কোনোদিন একবারও না) ডাক্তারকে যদি কোনো রুগীর জন্য মিকশ্চার তৈরি করে দিতে হয় তো ছেলেটিকে আগে থাকতেই চটপটে হাতে এক টুকরো কাগজ ভাঁজ করে তারপর সেটি গভীর মনোযোগ দিয়ে

কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সুন্দর 'দাগ' তৈরি করে ফেলতে দেখা যায়, এবং মিকশ্চার তৈরি হওয়া-মাত্র আঠা লাগিয়ে 'দাগ'টা শিশির গায়ে এঁটে দেয়। কাজটা করার সময় ছেলেটির চোখেমুখে বেশ একটা ব্যস্ততার ভাব ফুটে ওঠে। তেমনি কাজ সারা হয়ে গেলে তার মুখখানা প্রসন্ন দেখায়। যেন মিকশ্চারের শিশির গায়ে দাগ পরানোর মধ্যে ডাক্তারী-বিদ্যার কিছুটা স্বাদ পায় সে, তাই এই কাজে তার উৎসাহ ও আনন্দটা লক্ষ্য করার মতন। বাকি সময়টা ছেলেটিকে পা ঝুলিয়ে বাইরে রকের ওপর বসে থাকতে দেখা যায়। পরনে একটা হাফপ্যাণ্ট, আধময়লা ও একটু ছেঁড়ামতন একটা গেঞ্জি গায়ে, ডাগর চোখ, চুলগুলো কালো এবং কোঁকড়া, শ্যামলা রঙ, মোটের ওপর ছেলেটিও প্রিয়দর্শন। তবে ডাক্তারের মতো নিরামিষ ভাবটা তার চোখেমুখে নেই। না থাকারই কথা। চোদ্দ বছর বয়সের একটি কিশোরের স্বভাবসুলভ সজীবতা, উৎসাহ ও আবেগ নিয়ে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে সে নিমগাছের ডালে-ডালে চড়ুই বুলবুলি কাক শালিকদের হুটোপাটি ছুটোছুটি, নিমফল খাওয়া, কি ফল খেয়ে ঠোঁট ঘসা দেখে।

ডিসপেন্সারীটা সদরের সামিল। বাড়ির ভিতরের সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই। ভিতরে যাবার আলাদা রাস্তা। বাঁ-হাতি একটা সরু পথ একটু বেঁকে ভিতরের দিকে চলে গেছে। পথের দুধারে পাতাবাহার ও দুটো-একটা মৌসুমী ফুলের চারা চোখে পড়ে। কিন্তু সবগুলো কেমন অধর্মৃত, ধূলিমলিন। যেন কেউ শখ করে ঝোঁকের মাথায় বাগান করবে বলে এগুলো পুঁতেছিল, তারপর আর যত্ন নেয় নি, যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। একটা গাছও বাড়ে নি কি নতুন পাতা মেলে নি, কি মেলতে আরম্ভ করেছিল জলের অভাবে শুকিয়ে গেছে, পাতাগুলোর বেশির ভাগই দেখা যায় পোকায় খাওয়া। সরু পথের কিছুটা অগ্রসর হলে ভিতরের দিকের বারান্দা। বারান্দাটা ভাঙা ইঁট ও পুরোনো রাবিশে বোঝাই করে রাখা হয়েছে। তার মাঝখান দিয়ে দোতলায় ওঠার লোহার ঘোরানো সিঁড়িপথের কাছে যেতে হয়। পুরোনো সিঁড়ি। ওঠার সময় বেশ একটু কাঁপে। অনভ্যস্ত কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ভয় পেতে পারে, হুড়মুড় করে ওটা না ভেঙে পড়ে। না, ইঁট ও রাবিশবোঝাই বারান্দার ডানহাতি আরও একটা কামরা চোখে পড়ে। কিন্তু দরজা বন্ধ। একটা তালা ঝুলছে। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় কালিঝুলে ও মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন ছোট একটা জানালার একটা পাল্লা বন্ধ, একটা পাল্লা খোলা। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। অন্ধকার সয়ে গেলে চোখে পড়বে ভাঙা টেবিল চেয়ার খাট মাদুর ছেঁড়া বিবর্ণ ত্রিপলে সে-ঘর বোঝাই হয়ে আছে। এ-সব সম্পত্তির মালিক কে এবং কোনোদিন এগুলো ঘর থেকে বার করা হবে কিনা দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। আমাদের অবশ্য তার উত্তর জেনে লাভ নেই এবং প্রয়োজনও নেই। আমাদের লক্ষ্য দোতলা।

ঘোরানো সিঁড়ি শেষ হতে এক ফালি ঢাকা বারান্দা। করিডোর বলা যায়। একটু অন্ধকার মতন হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। তকতকে ঝকঝকে মেঝে। করিডোরের যেখানে শেষ সেখানে একটা জলের কল এবং জায়গাটার খানিকটা অংশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ঠিক বাথরুম বলা চলে না তবে আব্রু বাঁচিয়ে মেয়েরাও স্নান করতে পারে। দেয়াল খুব উঁচু নয়, কাজেই ওধারে কেউ থাকলে এধার থেকে চুল মাথা, আর মানুষটি যদি লম্বা হয়, ঘাড় গলা পর্যন্ত দেখা যায়।

করিডোরের বাঁ-দিকে (বাথরুমের দিকে যেতে) দুটো কামরা। ডান দিকে, ঠিক তিনটে বলা যায় না, দুখানা বড় এবং একখানা ছোট নিয়ে আড়াইখানা কামরা। ডান পাশের কামরা-গুলোর সব কটার দরজায় পর্দা ঝুলছে। বাঁ পাশের কামরা দুটোর একটির দরজায়ও পর্দা

নেই। একটা ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ আর একটা ঘরের দরজার দুটো পাল্লাই হা-খোলা হয়ে আছে। কাজেই বাইরে থেকে সে-ঘরের ভিতরের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। ছোট একটা খাটের ওপর একটি বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলে শুয়ে আছে। খাটের পাশে একটা টিপয়। তার ওপর একটা বিস্কুটের টিন। যেন টিনের মুখটা এইমাত্র কাটা হয়েছে। ঢাকনাটা ওপরের দিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে আর সেটা আয়নার মতো ঝকঝক করছে। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটি-দুটি বিস্কুট তুলে মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে পাশের কামরার দিকে তাকাচ্ছে। বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে আবার ঘাড়টা বালিশের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিস্কুট চিবোয়। গায়ে একটা গেঞ্জি, কোমর পর্যন্ত দুটো পা একটা পাতলা চাদরে ঢাকা। বস্তুত ছেলেটির দুটো পা-ই এত শীর্ণ যে দেখলে বিশ্বাস হয় না; যেন চাদরের তলায় অত্যন্ত সরু দুখানা কাঠ কি লোহার রড শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ছেলেটির কোমর থেকে আরম্ভ করে সবটা নিস্নাঙ্গ অসাড় হয়ে আছে। তার দাঁড়াবার এমন কি উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। দুবছর আগে সে দুরন্ত টাইফয়েডে ভোগে। তারপর থেকে এই অবস্থা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দিন-দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। পা দুটো যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি বুক, গলা, দুখানা হাত ক্রমশ শীর্ণ হয়ে আসছে। বিস্কুটের জন্য ও যখন টিনের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল হাতটা কাঁপছিল। তারি খাটের উল্টো দিকে আর একটা বড় খাট। সেখানে এখন কেউ শুয়ে নেই। একটা সবুজ রঙের সুজনি দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। খাটের পাশে একটা বড় ড্রেসিং-টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ যেন ওষুধের শিশি, বাক্স মনে হয়। ওষুধের মধ্যে বেশির ভাগই নানারকম ভিটামিন-বড়ি, ইঞ্জেকশনের ফাইল। একটা আলমারি টেবিলের ডান পাশে দাঁড় করানো। আলমারির ওপরের অংশটা কাপ ডিশ এবং ঐ ধরনের আরো কিছু বাসনপত্রে বোঝাই। নিচের অংশে কিছু বই ম্যাগাজিন রাখা হয়েছে। সেগুলো বড় এলোমেলো অবস্থায় আছে। যেন কোনো-কোনো সময় একটা বই কি একটা ম্যাগাজিন টেনে নামানো হয় তারপর তুলে রাখার সময় যা-করে হোক ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আলমারির সামনে আর একটা ছোট টিপয়ের ওপর একটা ফুলদানি। অনেকদিন আগে ফুল রাখা হয়েছিল। ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে, শুকনো ডাঁটাটা মাথা জাগিয়ে আছে। আলমারির উল্টো দিকের দেয়ালের র‍্যাকেটে কিছু কাপড়-জামা, মনে হয় ছেলেটিরও একটা-দুটো শার্ট-হাফপ্যাণ্ট ঝুলছে। বাকি যে কখানা জামাকাপড় দেখা যায় সেগুলো বয়স্ক কোনো পুরুষের। লক্ষ্য করলে সহজেই চোখে পড়ে এ-ঘরে কোনো মেয়েছেলের জামাকাপড় বা তার ব্যবহারোপ-যোগী একটি জিনিসও নেই। না থাক, ঘরে ঢুকলে সর্বাগ্রে যে-জিনিস চোখে পড়ে সেটা কিন্তু একজন মহিলার ফটো। ফুলসাইজ নয়, বুক পর্যন্ত, তাহলেও ব্রোমাইড-করা প্রকাণ্ড ছবি। বেশ চওড়া ফ্রেমে বাঁধিয়ে ছেলেটির খাটের পাশে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। এমন-ভাবে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে যে ছেলেটি শুয়ে থেকে ছবিটি দেখতে পারে। আর যে-কেউ দেখে অবাক হবে ছেলেটির মুখের সঙ্গে মহিলার মুখের কী আশ্চর্য মিল! সেই চোখ নাক চিবুক। তবে একটি মুখ স্বাস্থ্যের লাবণ্যে যৌবনের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত, আর একটি করুণ ক্ষীণ রুগ্ন ক্লান্ত। হ্যাঁ, ফটোর চেহারার বয়স এবং ছেলেটির বয়স মিলিয়ে যে-কেউ আন্দাজ করতে পারবে মা ও ছেলে। মহিলা—প্রতিমা সান্যাল বেঁচে নেই। দুবছর আগে টাইফয়েডে মারা যান। মা ছেলে একসঙ্গে অসুখে পড়েন। বাবু (ছেলে) বাঁচল, কিন্তু সর্বনাশা রোগ তার কি করে গেছে তা এতক্ষণ বলা হয়েছে।

এখন পাঁচটা বাজে। তাহলেও আষাঢ়ের বেলা। বাইরে প্রচুর রোদ। বাবুর পায়ের দিকের জানালা দিয়ে রোদ বাঁকা হয়ে ঘরের মেঝেয় পড়েছে। হাওয়াটা একেবারে বন্ধ হয়ে আছে বলে কেমন একটা গুমট গরম পড়েছে। শুধু বিস্কুট চিবিয়ে বাবুর ভালো লাগছিল না। গলা, জিহ্বা কেমন আঠা-আঠা শুকনো-শুকনো ঠেকছে। তাই আর একবার বালিশ থেকে মাথা তুলে পাশের কামরার দিকে তাকিয়ে সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'দুধ গরম হয়েছে মাসি?'

'হ্যাঁ, বাবা।' পাশের ঘর থেকে একজন বলল, 'এইবেলা ফুটবে। তা, এটা দিয়ে কি ছাই দুধ জ্বাল হয়। তিনবার নিভল। এখন আমি কাগজ ঘুটে জেলে তোমার—' বাকি কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল না, একটা বাসনের শব্দে কথা চাপা পড়ে গেল।

বাবু এ-ঘর থেকে বলল, 'আমি আজ বাবাকে বলব স্টোভটা দোকান থেকে সারিয়ে আনতে।' একটু থেমে পরে আবার পাশের ঘরকে উদ্দেশ করে আস্তে-আস্তে বলল, 'তা, কী দরকার ছিল অত কষ্ট করে দুধ ফোটাবার। এখন একটু হরলিক্স খেলে হত না?'

'না গো বাবা, হরলিক্স আর কত খাবে। সকালে খেয়েছ, দুটোর সময় তো ঐ করে দিলাম। তাজা দুধ একটু না খেলে দেহে বল হবে কেন, শরীরটা সকাল-সকাল সারবে না যে!' বলতে বলতে তলায় কাপড় দিয়ে ধরে একটা বড় কাঁসার বাটি হাতে বুড়োমতন একটি স্ত্রীলোক এ-ঘরে এসে ঢুকল। দুধ দেখে বাবুর মুখ প্রসন্ন হয়।

'তা, দাদাবাবুর আর কখন সময় হয় ওটা সারাই করতে দোকানে নিয়ে যাবে। সকাল নটায় তো বেরোয়, ফেরে রাত নটায়।' নিজের মনে কথাগুলো বলতে বলতে স্ত্রীলোকটি টিপয়ের ওপর গরম দুধের বাটি নামিয়ে রেখে আলমারির কাছে সরে গেল। একটা কাচের গ্লাস ও চামচ হাতে করে ফিরে এসে বাবুর খাটের পাশে বসল। 'দেখি, আমি আজ যাবার সময় স্টোভটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি কিনা। আমাদের পাড়ায় অতুলের কাছে তো নিয়ে যাই। তা ও হারামজাদা সারাইয়ের জন্যে আবার কত হাঁকে কে জানে। ওর তো ভাতের পয়সার আগে মদের কড়ি জোগাবার তাগিদ বেশি—হ্যাঁ, মিনসে রোজগার কি আর কম করে, মদ খেয়ে-খেয়ে সব উড়িয়ে দেয়।' বাটির দুধ কাচের গ্লাসে ঢেলে সে চামচ দিয়ে ঘন-ঘন নাড়ে। 'আর বৌটা রাতদিন কাঁদে। সোনাদানা তো দেবে না, হারামজাদা ভালো একখানা শাড়িকাপড় পর্যন্ত কিনে দিলে না মেয়েটাকে। বছর ঘুরল বিয়ে করেছে।'

'দাও, মাসি, এইবেলা জুড়িয়েছে নিশ্চয়।' বাবু দুধের গ্লাসের জন্যে হাত বাড়ায়।

'তুমি কি নিজের হাতে খেতে পারবে বাবা, পারবে না, আমি গ্লাসটা ধরাছি, তুমি মাথাটা একটু তুলে ধর,—না না, ওমনি পারবে না, কাজ নেই, এভাবে কতক্ষণ মাথা তুলে রাখা যায়।' হাতের গ্লাস টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে মাসি একটা পাশবালিশ তুলে ছেলেটির ঘাড়ের তলায় গুঁজে দেয়। তারপর দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ওর ঠোঁটের কাছে বাড়িয়ে দেয়। এবার বাবু আরামে, প্রায় চোখ বুজে, চুকচুক করে সবটা দুধ শেষ করে ফেলে। শূন্য গ্লাস টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে মাসি তোয়ালে দিয়ে ছেলেটির মুখ মুছিয়ে দেয়।

'কেমন পাগলা গরম পড়েছে, দ্যাখো।' তোয়ালেটা রেখে দিয়ে মাসি ময়লা আঁচলটা দিয়ে নিজের কপাল গলার ঘাম মুছতে লাগল। 'আষাঢ় পড়েছে, তেমন করে এখনো বর্ষাই নামল না। এবার লোকের কপালে দুখু আছে। পাঁজির কথা শাস্তর কথা।'

বাবু ফ্যালফ্যাল করে কখনও মাসির মুখের দিকে কখনও হলুদের দাগ-ধরা মাসির হাতের মোটা-মোটা আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে কথা শুনছিল। সারাদিন

মাসি অনেক কথা বলে, অনেক গল্প করে। শুনতে বাবুর ভালো লাগে। সময়টাও কেটে যায়। যদি কথা না কয়ে চুপচাপ ঘরের কাজ নিয়ে শুধু মাসি মেতে থাকত তো বাবুর একলা বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য ঠেকত। আর মাসি তা হতে দেবে কেন। প্রতিমার আমলের ঝি হরির মা। স্ত্রীকে শ্মশানে পুড়িয়ে অসুস্থ ছেলের কথা ভাবতে-ভাবতে নীরদ সেদিন পাগলের মতো বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ পেল নীরদ ঠিকে ঝি হরির মাকে দেখে। অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোক। শহরের ঝি-চাকর সম্পর্কে নীরদ অন্যরকম ধারণা পোষণ করত। তারা ফাঁক পেলে কামাই করে, সুযোগ পেলে ঘরের জিনিস সরায়, ব্যক্তিগত জীবন তাদের জঘন্য কুৎসিত। কিন্তু হরির মাকে দেখে নীরদ সেই ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। কালো বেঁটে ঘাড়-মোটা থ্যাবড়া-নাক একটা সাধারণ ঝির মধ্যে যে এত স্নেহ-মমতা বিবেক-বিচক্ষণতা লুকিয়ে আছে তা নীরদ জানত না। এই নিয়ে নীরদ তার নিচের তলার সেই ডিসপেন্সারীর ডাক্তার বন্ধু সুধাংশুর সঙ্গে কথা বলেছে। সুধাংশু সায় দিয়েছে। মাথা নেড়ে বলেছে, 'আছে, অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মধ্যেও মাঝে-মাঝে এমন কাউকে দেখা যায় যার মধ্যে রোগীর শুশ্রূষা করার সহজাত ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। অনেক সময় প্রফেশন্যাল নার্সরাও এমন চমৎকার সেবাযত্ন করতে পারে না।' নীরদ বলেছিল, 'আমি শুধু ক্ষমতার কথা বলছি না,—হার্ট, যতক্ষণ ও ছেলেটরার পাশে থাকে, আমি লক্ষ্য করি, যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সেবাযত্ন করে। টু স্পীক দি ট্রুথ, প্রতিমা মারা গেছে, আমি কাঁদছি না এখন, কিন্তু হরির মার চোখের জল তো শুকোচ্ছে না। যেন নিজের মার পেটের বোন মরেছে।' 'এককথায় কাইণ্ড হার্টেড আর কি। যাক ভালোই হল,' ডাক্তার-বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, 'অল টাইমের জন্যে ওকে রেখে দাও। খুব ভালো হল। তুমি তো আর মাসের পর মাস অফিস-কাছারি কামাই করে বাড়িতে বসে থাকতে পারছ না। ছেলেকে দেখবার জন্যে একজন কাউকে রাখতে হচ্ছিল।' হালকা নিশ্বাস ছেড়ে নীরদ বলছিল, 'ও ইয়েস, আমি অলরেডি ওকে বলেওছি। আমার আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই যে এখানে এসে থাকবে—ছেলেকে দেখবে। আর তা ছাড়া, ধর, একটা প্রাইভেট নার্স-ফার্স রাখতে গেলে কত টাকার ধাক্কা—বরং হরির মাকে কিছু টাকা বাড়িয়ে দিলে, কী বল?' 'না না, কিছু দরকার নেই, নার্স রাখতে যাবে কেন, আমি তো আছিই; এখন রুগীর কাছে একজন থাকতে হয়,— তা তোমার ওই হরির মা-ই বরং ভালো। বেশ পারবে, পারছে তো।'

সেই থেকে হরির মা। ভোর ছটায় এ-বাড়ি আসে, রাত নটায় নীরদ ঘরে ফিরলে তার ছুটি। কিন্তু তাও রাত্রে থাকতে পারে না বলে কি হরির মা কম দুঃখ করে। 'পোড়ার একটা সংসার পেতেছি, নইলে কি আমার প্রাণে সয় তোকে ছেড়ে যেতে।' মাসি আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। বাবু কথা বলে না। বড়-বড় চোখ দুটো মেলে মাসিকে দেখে। 'তাও বাবা তারকেশ্বরকে ডেকে-ডেকে অসুখটা যদি সারালাম কিন্তু আজও তো আমার খোকনকে দু-পায়ের ওপর দাঁড় করাতে পারলাম না।' এ-কথা বলার পর মাসির দু-চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ে। বাবু তখন আর মাসির মুখের দিকে তাকাতে পারে না। তারও চোখ ছলছল করে। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালে টাঙানো মার মুখ দেখে, চোখ দেখে। কিন্তু সে-চোখ স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, যৌবনের সুষমায় দীপ্ত প্রখর মদির। একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকলেই বাবু কেমন ক্লান্তিবোধ করে। তাই আবার ঘাড় ফিরিয়ে মাসিকে দেখে। যেন এখানেই সান্ত্বনা, এই চোখের জল, হলুদের দাগ-লাগা হাত, মোটা থ্যাবড়া নাক, লম্বা-লম্বা নিশ্বাস বাবুকে অনেক বেশি কাছে টেনে নিয়েছে। 'তুমি থামকা কাঁদছ মাসি,' বাবু পাল্টা সান্ত্বনা-বাক্য

শোনায়, 'বাবা বলেছে চেঞ্জে গেলে আমি একদম সেরে যাব, উঠে বসতে পারব, দাঁড়াতে পারব, খেলতে পারব। অফিসে ছুটি নিয়ে দু-তিন মাসের জন্যে বাবা আমাকে নিয়ে পুরী কি ওয়ালটেয়ার বেড়াতে যাবে।' শুনে মাসি একটু সময় চুপ থেকে ভাবে। তারপর আস্তে-আস্তে বাবুর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, 'তখন কিন্তু আবার আমার বুক খালি-খালি ঠেকবে,—তিনমাস আমার সোনামণিকে না দেখে কী করে থাকব এখন থেকে ভাবছি।' বাবুও একটু সময় চুপ করে ভাবে, তারপর রক্তহীন শীর্ণ ঠোঁট দুটো ফাঁক করে হাসে। 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে মাসি? বাবাকে বলল? সমুদ্দুর কোনোদিন দেখ নি তো।' বলবি, দ্যাখ না বলে দাদাবাবুকে? কিন্তুক—' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মাসি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, তারপর যেন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, 'আমার আবার পোড়ার একটা সংসার আছে যে—'

এভাবে গত তিনমাস ধরে দুজনের মধ্যে পুরী ওয়ালটেয়ার যাওয়ার গল্প হচ্ছে। বুঝি নীরদ একদিন বলেছিল। তারপর অবশ্য একদিনও বলে নি বা বলছে না। বাবা অফিসে ছুটি পাচ্ছে না, নাকি চেঞ্জে যাবার কথাটা ভুলে গেছে বাবু ঠিক বুঝতে পারে না। তাই মাসিকে কথাটা বলে এবং এই নিয়ে ওর সঙ্গে একটু গল্প করা শেষ করে জানালার দিকে চোখ রেখে ভাবে। রোদের চড়া রঙ কমে গিয়ে এখন নরম কমলা রঙ ধরেছে। জানালার বাইরে বড় নিমগাছটার পাতাগুলো তাই ভারি সুন্দর দেখায়!

'কলের জল চলে যাবে, ভিটামিন বড়িটা তো খাওয়া হল না সোনা!'

মাসির কথায় বাবুর চমক ভাঙে। জানালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে। শীর্ণ ফ্যাকাশে ঠোঁটে আর-একটু হাসি উঁকি দেয়— 'আমার মনেই নেই। দাও, হ্যাঁ, ওই নীল শিশিটা।'

মাসি উঠে গিয়ে টেবিল থেকে ওষুধের শিশি নিয়ে আসে। তারপর একটা ক্যাপসুল বার করে বাবুর মুখে তুলে দেয়। 'জল?' 'না,' চোখ বুজে বাবু ওষুধ গিলে ফেলে—'এখন জল ছাড়ই গিলতে পারি।' মাসি কথা না কয়ে শিশিটা যথাস্থানে রেখে আসে। বাবু তখনও মিটিমিটি হাসছে। 'কি হল?' মাসি আবার আঁচল দিয়ে কপাল মোছে। 'এমন বাঘা গরম পড়েছে!' সে-কথায় কান না দিয়ে বাবু আস্তে-আস্তে বলল, 'বছর ঘুরে গেল ওই ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তোমার হাতেই খাচ্ছি, আর তুমি আজো ভিটাটিন কথাটা ছাড়তে পারলে না, তাই তো হাসি।' 'কি জানি বাবা,' মাসি মুখটা বিকৃত করল—'আমি তো আর নেকাপড়া শিখি নি, মুখু মানুষ, ইংরিজি কথা আমার জিভে আসবে কেন।' ঘুরে দাঁড়ায় মাসি। কি যেন ভাবে, তারপর নুয়ে বাবুর কপালে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'যাই, উননে আঁচটা দিয়ে আসি, বেলা গেছে।'

মাসি পাশের ঘরে চলে যেতে বাবু আবার ঘাড় ফিরিয়ে জানালার বাইরে নিমগাছটার দিকে চেয়ে রইল।

দুই

সরু বারান্দার মতো প্যাসেজের ওপাশে আড়াই কামরার ফ্ল্যাটেও উননে আঁচ পড়েছে। পড়েছে একটু আগেই, এখন উনন ধরে গেছে। কিন্তু কড়াই বা হাঁড়ি চাপানো হয় নি। সব কটা কয়লা রক্তচক্ষু হয়ে যেন একটি মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ফরসা মুখ আগুনের

আভায় লাল টুকটুকে মাকাল ফলের রঙ ধরেছে। কিন্তু সেই রঙ দেখে যদি কেউ মুগ্ধ হয় যুবতীর আনত স্থির অবিশ্বাস্যরকম কালো চোখ জোড়া দেখলে ভয় পাবে। কেননা সেই চোখের দাহ দীপ্তি তেজ ধার যা-ই বলা যাক না জ্বলন্ত কয়লার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। যেন গনগনে উননটাকে চোখের ধমকে অপেক্ষা করতে বলে যুবতী গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। ময়লামতন ছোট হাতার একটা ব্লাউস গায়ে, পরনের মোটা তাঁতের শাড়িখানারও পাড়ের রঙ গিয়ে আঁচলের সুতো উঠে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা ধরেছে। কিন্তু তা হলে হবে কি, চোখের ধার দিয়ে সে যেমন আগুনকে শাসন করছে তেমনি ময়লা ব্লাউস ছেঁড়া শাড়ির ভ্রূকুটি বা ঠাট্টা তুচ্ছ হয়ে আছে প্রখর উজ্জ্বল সঠাম শরীরের ঐশ্বর্যের কাছে। কেউ যদি এখন ওর পিছনে এসে দাঁড়ায়, জামাকাপড়ের সমালোচনা করবে কি, তার আগেই তার চোখ কেড়ে নেবে যুবতীর ঘাড় ও পিঠের সুন্দর বাঁক, মেদবর্জিত কোমরের দুপাশের মসৃণ ঢাল্ সুডৌল নিতম্ব, দুটি রক্তিম গোড়ালি। হাঁটুর ওপর ঠেকানো দু-হাতের তেলোর মাঝখানে থুঁতনির ভর রেখে চুপচাপ বসে ও ভাবছে তো ভাবছেই। দেয়ালে কড়িকাঠে কালি জমে-জমে ঝুল নেমেছে। বাঁ দিকে একটা কাঠের বাক্সের ওপর মশলাপাটির কৌটো, তেলের শিশি, নুনের ভাঁড়। বাক্সের পাশে একটা মিটসেফ্। ডালা দুটো হা-খোলা হয়ে আছে। মিটসেফের ভিতরে একটা এলুমিনিয়মের বড় ডেকচি ও একটা কাঁসার বাটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। না, বাটিতে যেন কিছু চিংড়ি মাছ রয়েছে, বেশ লাল করে ভেজে-রাখা। আর, আর কি, একটা পিতলের কলস, দু-তিনটে বড় বালতি একপাশে দাঁড় করানো। সবগুলো জলে ভর্তি। কিছু থালা বাটি গ্লাস। সবগুলো মেজেঘষে ঝকঝকে করে মেঝের ওপর উপুড় করে রাখা হয়েছে। যেন একটু আগে বিকেলের কলের জলে সব ধুয়ে-মেজে আনা হয়েছে। এখনও ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরছে। এবং এটাও লক্ষ্য করা যায় জ্বলন্ত উনন সামনে রেখে বসে-বসে যে ভাবছে তার মাথার চুলও ভেজা। হ্যাঁ, বাসন-কোসন ধুয়ে তিনটে ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে সাফ করে তারপর বারান্দা পর্যন্ত ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে এবং এটা-ওটা আরও পাঁচরকমের গোছানোর কাজ সেরে মালা কলের জলে স্নান করে এসেছে। সেই বেলা তিনটে থেকে কাজ শুরু হয়েছিল। বুঝি এতক্ষণ কিছু ভাববার চিন্তা করবার অবসর ছিল না তার। এখন চিন্তাটা তাকে এত বেশি পেয়ে বসেছে যে উননে ভাতের হাঁড়ি চাপাবার আগে কেটলিতে একটু জল ফুটিয়ে চা করে খাওয়া দরকার—সে কথাও ও ভুলে আছে। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠতে মালা সেদিকে চোখ ফেরাল। টিক্ টিক্ টিক্—সত্যি সত্যি সত্যি—সিমেন্টের ওপর তিনবার আঙুলের টোকা মেরে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মালা উঠে দাঁড়াল। একটা বাঁকা হাসি ওর ঠোঁটে এখন উঁকি দিয়েছে। যেন এতক্ষণ ও যে-কথা ভাবছিল, যে-প্রশ্ন ওর বুকের মধ্যে আঁকসি হয়ে গেঁথে ছিল তার জবাব পেয়েছে। সত্যি সত্যি সত্যি—আর ভয় নেই, আর এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। মালা হাত বাড়িয়ে মিটসেফের ভিতর থেকে ভাতের হাঁড়িটা টেনে নামাল। নামিয়ে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে কান খাড়া করে ধরল। ই—ই—ই—পিছি, পিছি—ই—ই—ই। পাশের ঘর থেকে কান্না ভেসে আসছে। যে সুন্দর সুখের হাসিটুকু মালার ঠোঁটের কিনারে এইমাত্র উঁকি দিয়েছিল তা মিলিয়ে গেল ঠোঁট কঠিন হয়ে উঠল, চোখ দুটো আবার জ্বলতে লাগল। ই—ই—ই—পিছি পিছি—

ঝড়ো হাওয়ার মতো মালা পাশের ঘরে ছুটে গেল। 'কি, কি হয়েছে, দুধ খাইয়ে এইমাত্তর তো ঘুম পাড়িয়ে গেলাম, এখুনি জেগে উঠে জ্বালাতে শুরু করলি।'

দেড়বছরের শিশু ধমক খেয়ে বোবা অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকে। 'ও, আপনি কাঁথা অয়েলক্লথ আবার ভিজিয়েছেন।'

নাকমুখ কুঁচকে মালা কটমট করে শিশুর দিকে তাকায়। 'আর পারি না, আর আমি পারব না।' কাঁথা পালটে দিতে-দিতে মালা নিজের মনে কথা বলে। 'বাঁদীর মতন সারাদিন খাটুনি কত সয়। হাঁড়ি ঠেলে-ঠেলে আর বাচ্চা রেখে-রেখে আমি মরে যাব! অ্যাঁ—কখন ছটার জল গেছে, ইস্কুল ছুটি হয় উনার চারটেয়,—দু-ঘণ্টা কোথায় উনি ঘুরে বেড়ান, কার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান আমি কি আর কিছুই বুঝিনে—' হ্যাঁচকা টান মেরে শিশুটাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয় মালা। ব্যথা পেয়ে শিশু আর্তনাদ করে ওঠে। 'মর—মরে যা—তুই বাচ্চা বিয়োবে; বিয়োবার উদ্যোগ চলছে—'

মালা যত রেগে কথা বলে শিশু তত জোরে কাঁদে।

'এই, চুপ করলি, চুপ...চুপ...চুপ—'

পিসির চোখমুখের ভঙ্গি দেখে শিশু আরও ভয় পায়, আরও জোরে কাঁদে। 'বাপি... বাপি...বাপি...' ধৈর্যহারা হয়ে মালা শিশুর বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উত্তেজনায়, কেমন একটা বিজাতীয় আক্রোশে মালার ঠোঁট দুটো কাঁপছে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, হাতের আঙুলগুলো বাঁকা করে শিশুর গলার কাছে হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে ওঠে : 'মেরে ফেলব, গলা টিপে জন্মের মতো কান্না থামিয়ে দিই।' কিন্তু তা কি আর হয়, তা পারে না বলেই আঙুলগুলো শিথিল করে হঠাৎ কেমন অসহায়ের মতো মালা চুপ করে শিশুটার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকে, কান্না শোনে। তারপর হ্যাঁচকা টান মেরে ওটাকে কোলে তুলে নেয়। নিতে হয়। উপায় কি। 'চুপ...চুপ...চুপ...' বেশ জোরে-জোরে বাচ্চার মাথায় ঘাড়ে চাপড় দিতে-দিতে মালা পায়চারি করে। 'উঃ, মরে যাব, এই বোঝা আমাকে আর কতকাল বয়ে বেড়াতে হবে ভগবান জানে.....এই—এই—চুপ—চুপ, ঘুমো...দুটো ভাত খাই বলে এমন চাকরানীর মতো চব্বিশ ঘণ্টা খাটুনি, আর একজন হেসে ঢলে বাইরে ফূর্তি করে ঘুরে বেড়াবেন আর ঘরে ফিরে তৈরী ভাত খাবেন—বাস্, সংসারের কুটোটা এখান থেকে ওখানে নাড়তে হয় না, বাচ্চা রাখতে হয় না—কপালে কত সুখ নিয়ে এক-একটা মানুষ পৃথিবীতে আসে কত ভাগ্যি...এই চুপ...আমি ঠিক গলা টিপে জন্মের মতো ঠাণ্ডা করে দেব...চুপ চুপ—'

প্যাসেজে জুতোর শব্দ শুনতে পেলে মালার মুখ নিশ্চয় বন্ধ হত। কিন্তু তা আর শুনল কৈ! একদিকে বাচ্চার কান্না অন্যদিকে নিজের ক্ষোভ-মেশানো চাপা গর্জন। এক হাতে বেঁটে ছাতা অন্য হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কখন যে রমলা পর্দা সরিয়ে দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মালার চোখে পর্যন্ত পড়ল না। যখন পড়ল মালার মুখ কালো হয়ে গেল। রমলা কথা বলল না। ঘরে ঢুকে ছাতা ব্যাগ রাখল, জুতো ছাড়ল। তারপর শিশুকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ব্লাউসের বোতাম খুলে মুখে স্তন গুঁজে দিল। কথা না বলে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রফুল্ল রায় দোকান বন্ধ করে রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে ঘরে ফিরতে পারে না। ঘরে এসে আবার 'একটু চা হলে যেন ভালো হয়' এরকম চেহারা করে রমলার মুখের দিকে তাকিয়েও আজ বিশেষ সাড়াশব্দ পেল না। বুঝল স্ত্রীর মেজাজ ভালো নেই। অগত্যা জামাকাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে ভাত খেতে বসল। ঠিক তখন রমলা মুখ খুলল। বুকের

মধ্যে কত রাগ দ্বেষ ক্ষোভ আক্রোশ জমিয়ে রেখে সন্ধ্যা থেকে বৌদি চুপ করে দাদার ঘরে ফেরার অপেক্ষা করছিল। নিজের ঘরে বসে মালা বুঝল, শুনল—'আমি বাইরে ফুর্তি করে বেড়াই, আমি ইচ্ছা করে দেরি করে ঘরে ফিরি,—আমার ভাত রান্না করে আমার ছেলের বোঝা বয়ে লাটসাহেবের মেয়ের হাড় কালি হয়ে যাচ্ছে—'

দাদা চুপ। একটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ। বৌদি। মালা দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন হয়ে অন্ধকার ঘরে চুপ করে বসে রইল। ফোঁসফোঁসানি থামিয়ে রমলা আবার শুরু করে, 'কে বলেছিল এখানে আসতে, কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এখানে এসে শেকড় গাড়তে। আমার...'

'চুপ চুপ—' দাদার গলা।

'তা তুমি আমাকে চুপ করতে বলবে না তো কে বলবে। চুপ করে আমি গরুর মতন সারাদিন খাটব। ইস্কুল ছেড়ে আবার একটা-দুটো টুইশানির চেষ্টায় এপাড়া-ওপাড়ায় ঘুরে পায়ের তলা ক্ষয় করে ফেলব তারপর ঘরে এসে রান্নাবান্না করব তোমারও তাই ইচ্ছে, আমি কি বুঝি না।'

'আহা সে-কথা হচ্ছে না, বলছি, রাত হয়েছে এখন খাওয়াদাওয়া করবে, এখন ঝগড়া-ঝাটি করাটা কি ঠিক।' শান্ত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ প্রফুল্ল। স্ত্রীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টায় মুখ খুলেছে, ঘরে ফিরে এতক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলছে। বাস্, যেন আগুনে ঘি পড়ল—'আমি ঝগড়া করি না, একটা বাজে ক্যারেক্টারের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়—'

'ছি ছি, তুমি কী বলছ, পাশের ফ্ল্যাটে লোক আছে।'

'থাকুক, লোকে জানে না, লোকে দেখছে না? বিয়ের বছর না-ঘুরতে যে-মেয়েকে স্বামী তাড়িয়ে দেয় তার আবার—'

'এই রমলা—' প্রফুল্ল ধমক দেয়।

'এটা কি মিথ্যা কথা, এটা কি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মিথ্যা। মালার নিজের কোনো দোষ নেই।' সংযত গম্ভীর গলায় প্রফুল্ল বলে, 'আমি একদিন তোমাকে বলেছি, মানিক অত্যন্ত খারাপ টাইপের ছেলে। তা আগে তো আর জানা যায় না। বিয়ের সময় দিনকতক এরা এমন বকধার্মিক সেজে থাকে যে কারো বাবারও ক্ষমতা থাকে না কিছু বোঝে, কিছু জানতে পারে। অবিশ্যি আর-একটু খোঁজখবর নেয়া আমারই উচিত ছিল। বরানগরের কেষ্টবাবু যে আমাদের বিশেষ পরিচিত আমার দাদার বিশেষ বন্ধু তা তো তখন জানতাম না। পরে কেষ্টদা এবং আরো দু-চারজনের কাছে যা শুনিছি তোমাকে সেসব আমি বলেছি। কি, সেদিনও কেষ্টবাবুর ভাগ্নে আমার দোকানে এসেছিল। বলল, মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া, রাহাজানি হেন কুকাজ পৃথিবীতে নেই যা মানিক রুস্ত করেনি। সে যে কতখানি নিচু চরিত্রের ছেলে—'

'বেশ তো, তাই তো বলছিলাম, অনেকদিন বলেছি তোমাকে কেস্ কর, কেস্ করে অন্তত তোমার বোনের খোরপোশটা আদায় কর। আমি আর কত—' ফোঁস ফোঁস শব্দ। 'আমার শরীর শরীর না, আমি খাটছি না? কী দরকার আমার ঘরের বাইরে গিয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে চাকরি করার। তোমার সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি গেল, দিলুম গায়ের গয়নাগুলো খুলে, দোকান দিলে, তা চায়ের দোকান থেকে দু-চারদিন অন্তর এক-আধ প্যাকেট চা ছাড়া ঘরে আর কী আনতে পারছ তা তুমিও জান। বুঝলাম, সংসার চলে না। পঞ্চাশ টাকা ঘরভাড়া

দিতে হয়, তিনটে মুখ। বাচ্চার দুধ আছে। আ্যাঁ, আমি একটা ভালো টঁনিক-ফনিক খেতে পারলাম না পোয়াতী হবার পর থেকে আজ অবধি। চাকরি করতে বেরিয়েছি! তাও না হয় বুঝলাম করছি চাকরি, আনছি দুটো পয়সা, খাওয়াচ্ছি। আর কিনা আমার খেয়ে আমার পরে আমার ওপর তম্বি! আমাকে হিংসা? আ্যাঁ, আমার ছেলের গলা টিপে চিরকালের মতন ঠাণ্ডা করে দিতে ওর হাত নিশপিশ করছে।'

'বলেছে এ-কথা মালা?'

'বিশ্বাস না হয় বোনকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস কর। একটু কাঁদছিল বলে বাপিকে ও যে কী করবে ঠাওর করতে পারছিল না—বাব্বা, কী ফোঁসফোঁসানি, কী লম্ফঝম্ফ—আর আমার আদ্যশ্রাদ্ধ—দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম তো সব চোখে, কানে শুনলাম,—পারবে ও অস্বীকার করতে?'

'মালা, মালা!'

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এক পা এক পা করে মালা দাদার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

'এসব কী শুনছি?' প্রফুল্লর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। থালার ভাত থালায় পড়ে আছে।

মালা নীরব।

'না, আমার কথা হচ্ছে, তুমি কি অবস্থায় পড়েছ, কি অবস্থায় এখানে এসে তোমাকে থাকতে হচ্ছে এটা ভুললে তো চলবে না। আমি—আমার অবশ্য কোর্টে-ফোর্টে যাবার ইচ্ছে নেই—কেননা লোকনিন্দাকে আমি চিরকাল, সেই আমার আট বছর বয়স থেকে, যমের মতো ভয় করি। আর স্কাউণ্ড্রেলটার কাছ থেকে পয়সা আদায় করা—দরকার নেই, দরকার নেই—কী হবে, আমি যদি দু-মুঠো খাই আমার বোনও খেতে পারবে। নিজের তো এই চরিত্র—আর তুই কিনা আমার বোনকে চরিত্রের বদনাম দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিলি? কী হবে তোর কাছ থেকে দশ টাকা মাসোহারা নিয়ে—তোর পয়সায় আমি থুথু ফেলি।' প্রফুল্ল থামল। উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছিল। যেন কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেছে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল। একবার স্ত্রীর দিকে তাকায়। তারপর। 'তাই আমি বলছি, এরকম করলে তো চলবে না। আমি সেই সকালে উঠে দোকানে চলে যাই, তোমার বৌদিকে কাজে বেরোতে হয়, এদিকে ঘরের রান্নাবান্না ধোয়ামোছার কাজ থাকে, একটা বাচ্চা আছে—কাজেই এদিকটা একজনকে সামলাতেই হবে। এখন এসব চিন্তা না করে তুমি যদি রাগারাগি কর তো—অবশ্য একলা তোমার ওপর চাপ পড়ে আমি অস্বীকার করছি না—তাহলেও যখন যে-অবস্থায়—' প্রফুল্ল থামল।

রমলার চোখ দুটো জ্বলছে। খুব অস্বস্তি বোধ করছে ও। মালা একবার সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে। দাদার গলার নরম সুরটা বৌদির মোটেই ভালো লাগছে না। তাই দাদা কথা বন্ধ করেছে কি রমলা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল, 'বুঝলাম তো, বোনকে অনেক সান্ত্বনা দেওয়া হল, রাগটাগ না করতে বোঝানো হল, কিন্তু আমার সম্পর্কে যে ও এমন একটা সাংঘাতিক বাজে রিমার্ক করেছে তার বিচার হল কোথা, সেটা তুমি বেমালুম চেপে যাচ্ছ কেন?'

প্রফুল্ল অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে স্ত্রীকে চুপ করতে বলতে রমলা গলার স্বর আর এক ডিগ্রী চড়িয়ে দিল, 'আমি বাইরে ফুর্তি করতে যাই! তাই বলছিলাম জামাই খারাপ কি মেয়ে খারাপ কে তার বিচার করে। ও নিজে খারাপ না হলে আমার সম্পর্কে এমন একটা

অদ্ভুত বাজে ধারণা মাথায় আনতে পারে?—নির্লজ্জ বেহায়া ছোটলোক কোথাকার।'

'ছি ছি ছি—তুমি প্রফুল্ল স্ত্রীকে কি বলে বোঝাবে ঠিক করতে পারছিল না। 'যা তো মালা, তোর ঘরে যা—'

মালা নিজের ঘরে ফিরে এল। এসে বসল না। অন্ধকার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে কান পেতে রইল। রাগে আক্রোশে তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠছিল। তার চোখ দুটোও জ্বলছিল। কান গরম হয়ে গেছে, গরম নিশ্বাস বেরোচ্ছে। পাশের ঘরে দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। তার অর্থ রমলা রাগ করে তক্তপোশের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে শয্যা নিলে। দাদার চাপা বিরক্ত কণ্ঠস্বর। কথাগুলো ভালো বোঝা গেল না। কেবল একবার শুনল মালা প্রফুল্ল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বলছে, 'এই অশান্তি আর ভালো লাগে না,—ভগবান আমাকে এমন বিপদে ফেলেছে!'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মালা শুয়ে পড়ল। শোবার সময় চিন্তা করল কোনো কাজ সে ফেলে এসেছে কি। না, দুজনের ভাত থালায় বেড়ে পাশের ঘরে ঢেকে রেখে এসেছিল সে। রান্না নামিয়েই ওটা সেরে রেখেছিল। আর বাকি ভাতে জল ঢেলে হাঁড়ি তুলে রেখেছিল। দাদা খাবে। রাগ এবং বিরক্তি কমলে এক সময় খাবেই। আর একজন খাবে কিনা এবং না খেলে দাদা সাধাসাধি করবে কিনা মালা বলতে পারে না, তা নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। তবে তার ক্ষুধা নেই। তাই মিটসেফের মধ্যে হাঁড়িটা ঢুকিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের মেঝে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে আলো নিভিয়ে মালা দরজায় তালা ঝুলিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছে। মালা খেল কি না খেল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না সে ভালো করে জানে। এবং এর জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। 'আমার কথা লোকে যত কম ভাবে, যত বেশি ভুলে থাকে, বিশেষ করে দাদা-বৌদি, তত ভালো'—টান-টান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের দুটো কোণা আঁকড়ে ধরে মালা চিন্তা করল। চোখের কোণায় বড় একটা গরম জলের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে, মালা মুছল না, ফোঁটাটা ভেঙে গাল গড়িয়ে বালিশে পড়ল। 'রমলার সঙ্গে তো আমার ঝগড়া করার কথা নয়, তার ওপর রাগ করারও কিছু নেই। ছোটলোক বলে বলুক, নির্লজ্জ বেহায়া বলেছে বলুক।' মালা বরং নিজেকেই এখন শাসন করতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুতাপ হচ্ছে। কী দরকার ছিল বাচ্চাটা কাঁদছিল বলে তখন এমন রাগারাগি করার, গরম হয়ে রমলা সম্পর্কে অত সব বাজে কথা বলার। সে হাঁড়ি ঠেলবে, বাচ্চা দেখবে—এ-বাড়িতে যেদিন পা দিয়েছে সেদিন থেকেই তো তা ঠিক হয়ে গেছে। এই নিয়ে সে অভিমান করতে যায় কেন। রোগা ঢ্যাঙা কালো-রঙ রমলা। কেবল বি.এ. পাশ করেছে এই শুনে দাদা ওকে বিয়ে করেছিল। এবং বিয়ে করে দাদা সুখী, রমলা সাধ্যমতো সুখ দিচ্ছে, রোগা শরীর নিয়ে স্বামীর সংসারকে চালু রাখতে চাকরি পর্যন্ত করতে বেরোচ্ছে। এই জন্য মালা ঈর্ষা করে রমলাকে? গালে জলের দাগ কিন্তু ঠোঁটে একপলকা হাসি জাগল মালার। যদি রমলাকে ঈর্ষা করতে হয় তো সংসারে ঈর্ষা করার আর বাকি থাকে কে। পরের সুখ দেখে তার বুকের ভিতর যদি কাঁটা খচখচ করে তো খোঁচায়-খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে পচেগলে অনেকদিন আগেই তার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শেষ তো ও হতে দেয় নি নিজেকে! দেবে না। বরানগর থেকে চলে আসার সময় রিক্‌শায় বসে এমন একটা ইচ্ছা—এ-ধরনের একটা জোরালো প্রতিজ্ঞায় বুকের শিরাগুলোকে শক্ত করে তুলতে পেরেছিল বলে না আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে অত শান্তভাবে ও পা দিতে পেরেছিল।

বোনের ভাগ্যবিপর্যয় দেখে দাদা কপালে করাঘাত করেছে, রমলা মুখ কালো করেছে, ঠোঁট বেঁকিয়েছে। বাস্, এই পর্যন্ত। এর বেশি তারা কিছু করে নি, করুক, মালাও চায় নি। হয়তো এখানে দোতলার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের দেয়ালগুলোর ভিতর সে আটকা পড়েছে। কিন্তু আটক থেকেও, সবচেয়ে যা তার বেশি দরকার—মন, মনের স্বাধীনতা এই কমাসে কি যথেষ্ট ভোগ করে আসছে না ও। আর কী চাই,—লম্বা নিঃসঙ্গ দুপুর, কি একলা ঘরের এমন বুকচাপা অন্ধকার রাতের সীমাহীন বিস্তারে মনকে যতদূর খুশি ছেড়ে দেওয়ার, যেভাবে খুশি একে নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুখ কটা মেয়ে পাচ্ছে! সুতরাং বরানগর ছেড়ে চলে আসার সময়কার দুরন্ত ইচ্ছাই তো তার জয়ী হল। শেষ হয়নি, বরং সে বাঁচছে, বাড়ছে, বসন্তের পত্রপুষ্পশোভিত একটা গাছের মতো এই মনের মধ্যে সে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ল যে। কেনই বা তা হবে না। উনিশ বছরের যৌবন কি বসন্তের একটি পুষ্পিত তরু নয়। শরীর টান-টান করে উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে বালিশের কোণা দুটো আঁকড়ে ধরে মালা অন্ধকার দেয়াল দেখতে লাগল। 'বরং তুমি রমলাকে করুণা করতে পার, তার জন্যে একটু দুঃখ কর।' মনে-মনে বলল সে। উনিশ বছর বয়স কী ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল মালা দেখেনি, কেননা রমলার তখনও বিয়ে হয়নি, চব্বিশ বছর বয়সে রমলার কতটুকু বাকি আছে তা চোখের ওপর দেখছে। বলা উচিত নয়, ভাবা পাপ, কিন্তু তাহলেও ভেবে এক-এক সময় মালা অবাক হয়, দাদার মতো শক্ত-সমর্থ এমন একটি সুপুরুষ কী করে দিনের পর দিন পেত্নীর মতো, শুঁটকির মতো দেখতে একটা মেয়েকে নিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। 'সেই রমলা মুখ কালো করে থেকে, চাপ-চাপ কাজের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে, আর দেড়বছরের একটা শিশুর দুধবার্লি খাওয়ানো ও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ভিজে কাঁথা পালটানোর দায়িত্ব বুঝিয়ে যতই চাকরি করতে বেরোক, তোমার ও কতটুকু ক্ষতি করতে পারল, তোমার হয়ে ওঠার তোমার বেঁচে থাকার কতটা বাধা দিতে পেরেছে সে? পারেনি, পারবে না।' একটা গরম নিশ্বাস বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মালা শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। এখানে এসে গোড়ার দিকে এপাড়ারই একটা প্রাইমারি স্কুলে একজন টিচার নিচ্ছে শুনে মালা দাদার কাছে কথাটা তুলেছিল, চেষ্টা করলে হয়ে যেতও বা! কিন্তু দাদা কথা বলার আগে বাধা দিয়েছে ওই পেত্নী। 'আমি একটা গ্র্যাজুয়েট হয়ে ষাট-সত্তর টাকার বেশি আনতে পারছি না আর ম্যাট্রিকুলেশনের বিদ্যা নিয়ে তুমি,—তোমাকে কটাকা মাইনে ওরা দেবে আমি জানি না। দেবে কিছু ঠিকই। কিন্তু তার সবটাই তখন তোমার শাড়ি শায়া ব্লাউসে খেয়ে ফেলবে। কিছু খাবে সাবানে, কিছু তেলে। ভাতের কথা ছেড়ে দাও, টিফিনের জন্যে সারা মাস দু-একটাকার বেশি খরচ করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গেল তোমার দিক। এদিকে তুমিও বেরোবে আমাকেও বেরোতে হচ্ছে। কাজেই একটা ঝি। তার খোরাক তার মাইনে। তার অর্ধ ঝিয়ের মাইনে প্লাস তোমার খোরাক প্লাস ঝিয়ের খোরাক। আর এইসব হাতি-হাতি খরচের ধাক্কা সামলাতে হবে আমাকে এবং তোমার দাদাকে। এই লাভ হবে আমাদের তোমাকে চাকরি করতে পাঠিয়ে।' মালা আর কোনোদিন চাকরির নাম মুখে আনে নি। তার পর থেকে আরম্ভ হল দেয়াল আর দেয়াল। কিন্তু তাতে মালার লোকসান হয়নি কিছু। এই দেয়ালঘেরা এক-একটা দুপুরেই পলাশের আগুন হয়ে তার চোখের সামনে জ্বলতে থাকে; রঙিন প্রজাপতি হয়ে বিকেলটা বুকের মধ্যে উড়ুউড়ু করে। আজও করছিল, কিন্তু মালার নিজের দোষে সব নষ্ট হয়ে গেল—রমলার বাচ্চাটাকে নিয়ে অত মাথা গরম করার দরকার ছিল কি। বাচ্চা, উনুন, ধোয়ামোছা মাজাঘষা সব করেও যে সুন্দরভাবে মনকে বাঁচিয়ে

রেখে ডালপালা মেলতে দিতে পারে, ফুল ফোটাতে পারে।

উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে মালা ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেল। তারপর দরজার কাছে সরে গিয়ে কান পেতে রইল। না, পাশের কামরা না, দাদা না রমলা না, রমলার বাচ্চা, রমলার ঘরদরজা বাসনকোসন সেলাইফোঁড় ধোয়ামোছা কয়লা ধরানো কয়লা সাজানো সব ভুলে গিয়ে রাত্রির উত্তাল কালো ঢেউয়ের ফেনার ওপর একটা ফুলের মতন নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মালা দুলতে লাগল, কাঁপতে লাগল।

তিন

আজ সকাল থেকে নীরদের মন খারাপ, অবশ্য দিনের চেহারাটা তেমনি হয়ে আছে বলা যায়। সবটা আকাশ ধোঁয়ার রঙের মেঘে ঢেকে রেখেছে। একবার একটু বাতাস বইছে না। কেমন গুমোট ভাব। মাথা-ধরা গা-বমি-করা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। মনেই হয় না এ-দিনে বেঁচে সুখ আছে। এরকম একটা দিনে কী করলে ভালো লাগবে, কারো ভালো লাগছে কিনা, অথবা ভালো লাগবার জন্য কেউ খাওয়ার কি কাপড়চোপড় পরার দিক থেকে না কি রোজ যে-সব কাজকর্ম করে সে-সবের একটু রকমফের করছে চিন্তা করার মতন। অর্থাৎ আমার ভালো লাগছে না, কারো লাগছে কি এবং সেটা কি দিয়ে—এই। উত্তর হয়তো নেই কিন্তু তবু ভাবতে হয়, এমন দিন, এমন বিদঘুটে আকাশের চেহারা, বিবর্ণ ধূসর চারদিক।

নীরদ হাতঘড়ি দেখল। চারটে। সেটা অবশ্য কথা নয়। ইচ্ছা করলে এখনি সে উঠে বেরিয়ে পড়তে পারে। আর পাঁচজন কর্মচারীর মতন কাটা মিলিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠতে হবে সেটা নীরদের বেলায় খাটে না। তবে পদাধিকারের সুযোগ সাধারণত সে নেয় না। ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়। তাছাড়া উঠতে তার ইচ্ছাও করছিল না। নিজের কামরায় একলা চুপচাপ জানালার বাইরে চোখ পাঠিয়ে অনেকদিন সে এভাবে (হাতের কাজ শেষ হয়ে গেলে) বসে কাটায়। অফিসটা মন্দ না। কোথায় ব্যবসাবাণিজ্য চলছে, এখানে তার হিসাবপত্র রাখা হচ্ছে। পাট চা টিন বাঁশ অনেককিছুর কেনাবেচা আমদানী-রপ্তানীর হিসাব রাখছে মিশন রো'র এই লাল চারতলা বাড়ি। অবশ্য ইচ্ছা করলে বেলা চারটের মধ্যে যেমন নীরদ বেরোতে পারে তেমনি এমন দিন আসে যখন রাত নটা সাড়ে-নটা পর্যন্ত বসে থেকে নীরদ স্টেনোগ্রাফারকে ডাকিয়ে ডিক্‌টেশান দেয়, কাগজপত্র টাইপ করায়, তারপর সেগুলো পরীক্ষা করে সই দিয়ে তবে তার ছুটি। যার স্বাধীনতা বেশি তার দায়িত্বও বেশি। এখন বেশ কিছু কাজ নিয়ে মেতে থাকলে যেন ভালো লাগত, নীরদ ভাবল, শরীর ও মনের আড়ষ্টতা দূর হত। টেবিলের ওপাশে সরিয়ে-রাখা ফাইলগুলোর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়েও রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু, আশ্চর্য, হাত বাড়িয়ে কিছু কাগজপত্র টেনে আনবে সেই উৎসাহ কোথায়। বরং তৎক্ষণাৎ জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ পাঠিয়ে সে বিড়বিড় করে উঠল, 'ডাল্, অত্যন্ত ডাল্ ওয়েদার। সুতরাং—'

সুতরাং এ-দিনে হাত-পা গুটিয়ে দরকার হলে চোখমুখ বুজে শামুকের মতো চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় কি। ভাবল নীরদ। হাই তুলল একটা। টিন থেকে সিগারেট তুলল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—নীরদের মনখারাপ হওয়ার, আড়ষ্ট নির্জীব হয়ে থাকার এই কি একমাত্র কারণ। নীরদ নিজের কাছে তা স্বীকার করতে পারে

না। সিগারেট ধরিয়ে সে সিলিং-এর দিকে তাকায়। অবশ্য একটা মোটা রকমের কারণ সেই ভোর পাঁচটা থেকে এখন পর্যন্ত তার বুকের একটা পাশ চাপ দিয়ে ধরে রেখে যন্ত্রণা দিচ্ছে। হ্যাঁ খোকা, বাবু, মা-হারা পশুদু রুগ্ন ছেলে, নীরদের একমাত্র ভরসা একটি ভবিষ্যৎ। অবশ্য এটা নীরদ স্বীকার করে, তার সন্তান বলে নয়, বারো বছরের আর পাঁচটি ছেলের চেয়ে বাবুর সহ্যশক্তি ধৈর্যগুণ, যা-ই বলা যাক না, বেশি, অনেক বেশি। দেখে সময়-সময় নীরদ অবাক হয়। প্রতিমার কাছ থেকে খোকা এটা পায়নি, যদি পেয়ে থাকে—নীরদের কাছ থেকে। ধীর স্থির শান্ত প্রতিমা কোনোদিন ছিল না। একটুতে খুশি হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে, আবার সামান্য একটা কিছুতে ভয় পেয়েছে, হতাশ হয়েছে, কান্নাকাটি করেছে। একবার—যাক, সেসব অনেক কথা। তাদের চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে ছোট বড় মাঝারি কত ঘটনাই তো ঘটেছে। নীরদের কানপুরের চাকরি ছাড়া, কলকাতায় আসা, মাঝখানে প্লাই-উডের ব্যবসায় হাত দিয়ে কিছু টাকা খোয়ানো (নীরদের এখনও হাসি পায় বিজনেসে কেন সে নাক ঢুকিয়েছিল—যা সে কোনোদিনই পারেনি, পারবে না; যারা ওসব করে তাদের ধাত আলাদা, নীরদের মতো মানুষদের জন্য ধরাবাঁধা রাস্তা—চাকরি)। কিন্তু তাই বলে নীরদ অস্থির হয়ে পড়েছিল কি? আর সামান্য আড়াই হাজার টাকার জন্য প্রতিমার সে কি নিদারুণ শোক! তা-ও কি এক-আধদিন—একটা বছর দিনরাত শুধু এক বিলাপ। তারপরই অবশ্য নীরদ এই চাকরিটা পেয়ে যায়। মাইনে এলাউয়েন্স মিলিয়ে মাসকাবারে পকেটে করে স্বামী ঘরে কত আনবে শুনেই ওর চক্ষুস্থির। হ্যাঁ, অতিরিক্ত খুশি হয়েই। আর তখনি শুরু হৈ-চৈ লাফালাফি। 'ফ্ল্যাট নাও, বালিগঞ্জের দিকে সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া কর—এখানে এই বাড়িতে তোমাকে মানাবে কেন, অফিসার, চালচলন থাকা-খাওয়া সেরকম হবে, না, আমি শুনব না, উঁহু,—বা-রে—' নীরদকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রতিমার দেড় শ টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া করার মোহ ভাঙাতে হয়েছিল। 'খামকা কতগুলি টাকা মাস-মাস পরের হাতে তুলে দিয়ে লাভ কি। বরং ব্যাঙ্কে কিছু-কিছু ফেলে রাখলে শহরের ওপরে না হোক বাইরের দিকে পাঁচ-সাত কাঠা জমি নিয়ে আমরা ছোটখাটো একটা বাড়ি করতে পারি—সেটা ভালো, চিরকালের মতো মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই হয়।' তখনকার মতো বুঝিয়েছিল সে স্ত্রীকে, কিন্তু পরে এই বোঝানোর জের টানতে নীরদকে প্রাণান্ত হতে হয়েছিল। 'কৈ, তুমি জমি দেখছ না, বা-রে,—কেবল বেলাম পরলাম চাকরি করলাম তাতেই সব শেষ হয়ে গেল। আমার বাবু বড় হবে, আমার বাবুর বৌ আসবে। তুমি এখানে এনে তুলবে বৌকে? দেড়-কামরার এই বাসায়? আমার যেন তার আগে মৃত্যু হয়—' ব্যাঙ্কের পাশ-বই ওর চোখের সামনে তুলে ধরে নীরদ হাসত, 'আরো কিছু জমতে দাও, এখনো তিনের ঘরে অঙ্ক, চার, পাঁচ, হ্যাঁ, পাঁচের কাছাকাছি উঠলে আমি আর চুপ করে বসে থাকব না। নারকেলডাঙা হোক, সোদপুর বেলঘরিয়া বা তোমার ওদিকে যাদবপুর ঢাকুরিয়া, হ্যাঁ, টালিগঞ্জের ওধারটায়ও বেশ ভালো-ভালো জমি আছে।' 'ও বাবা,—তাহলে তো আরো পাঁচ বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে,—পাঁ-চ ব-ছ-র!' বেচারার উজ্জ্বল বিশাল চোখ জোড়া আজকের এই আষাঢ় আকাশের মতো ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে সেদিন। তারপর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। 'হল না, কিছু হবে না, আমি জানতাম, বাড়িঘর আমার অদৃষ্টে নেই,—ভগবান এত সুখ দেবেন তবেই হয়েছে।' হলও তাই। পাঁচ বছর প্রতিমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। তার আগেই ঈশ্বর তাকে ডেকে নিল। রুমালের কোণা দিয়ে নীরদ চোখ মুছল। টাকাপয়সা বাড়িঘর তো বড় কথা, নিজের কি ছেলের কি নীরদের সামান্য পেটখারাপ বা সর্দি-কাশি

হয়েছে তো বেচারা এমন ঘাবড়ে গেছে! যেদিন নীরদ সকাল-সকাল অফিস সেরে বাড়ি ফিরেছে সেদিন প্রতিমা সদ্য-পাটভাঙা শাড়ি-শায়া-ব্লাউজে কাজলে-কুঙ্কুমে সেজে ঠোঁটভরা হাসি আর ভ্রূবিলাস নিয়ে ঝলমল করত। একটু দেরি হয়েছে, একটু রাত হয়েছে, নীরদের আটটায় ফেরার কথা নটা বাজতে চলল তো এক-একদিন কী বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে প্রতিমা। আশেপাশে কারো বাড়িতে টেলিফোন নেই, ছুটে গেছে মোড়ে। সেখানে লোহালক্কড়ের দোকানের টেলিফোন তুলে প্রথমে অফিস, যদি অফিস থেকে নীরদের সাড়া না পেয়েছে তো— হ্যাঁ, তাই একদিন করেছিল প্রতিমা, সোজা লালবাজারে খবর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে দরজায় খিল দিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছিল আর টেনে-টেনে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করেছিল। এমন অস্থিরচিত্ত ছিল ও, এমন ছেলেমানুষি করেছে চিরকাল। নীরদ কখনও ধমক দিয়েছে কখনও আদর করে বুঝিয়েছে। আর বাবু বাবু। বাবু ছাদে যেতে পারবে না—পড়ে যাবে, খেলাধুলা করতে পারবে না—গাড়িচাপা পড়বে, রোদে যাবে না—অসুখ করবে,—বৃষ্টির জল এক‌ফোঁটা মাথায় লাগিয়েছে ছেলে তো প্রতিমার হৈ-রৈ চিৎকার, ধমক, লাফালাফি।—নিউমোনিয়া হবে, আমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারব না, উঃ, কী খারাপ অদৃষ্ট! এমন সৃষ্টিছাড়া ছেলে নিয়ে আমি কোথায় যাব, ইত্যাদি চব্বিশঘণ্টা। প্রতিমা বুঝত না ন-দশ বছরের ছেলেকে সবসময় ঘরের ভিতর আটকে রাখা যায় না। তার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এটা করা উচিতও না। আর-দশটি ছেলের মতো তাকে ছুটোছুটি খেলাধুলা করতে ছেড়ে দিতে হবে। গায়ে একটু বৃষ্টির ছাঁট কি রোদের ঝাঁজ লাগলে মরে যাবে না। বরং ভালো। কলকাতা শহরে আলো-বাতাসের এমনি তো অভাব। না, প্রতিমার কেবল অ্যাক্‌সিডেন্ট আর অসুখবিসুখের ভয়। তা, আজ তো ছেলের এই অবস্থা! নীরদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বরং প্রতিমা আগে মরে গিয়ে ভালো হয়েছে। চিন্তা করল সে। আজ বেঁচে থেকে এই অবস্থায় বাবুকে যদি দিনের পর দিন দেখতে হত তো প্রতিমার কী অবস্থা হত অথবা কী অবস্থা ও নিজে তৈরি করত চিন্তা করে নীরদ শিউরে উঠল। ঈশ্বর যা করে ভালোর জন্য করে। নীরদ মনে-মনে বলল। হ্যাঁ, এইজন্যই ধৈর্য সহিষ্ণুতার এত দাম পৃথিবীতে। নীরদ সহ্য করছে। অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে সে অপেক্ষা করছে, দেখছে, চেষ্টা করছে,—যদি ছেলে ভালো হয়,—তাছাড়া আর কি করার আছে তার। মানুষের কর্তব্য মানুষ পালন করে। ফল ভগবানের হাতে। মাথা গরম করার অস্থির হওয়ার কোনো মানে হয় না। নীরদের সেই প্রকৃতিই নয়। আজ ছেলের এই অবস্থা বলে নয়, ছেলেবেলা থেকে নীরদ স্থির ধীর গম্ভীর সতর্ক সহিষ্ণু। তার ছেলে বাবু এই প্রকৃতি পেয়েছে। নীরদ সেজন্যে সুখী। এমন অসুস্থ একটি—শিশুই বলা চলে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়িতে ঝি হরির মা ছাড়া আর এমন কেউ থাকে না সারাদিনে একবার একটু সময় পাশে বসে খোকার কপালে হাত বুলোয়, আদর করে। কিন্তু তাই বলে তো বাবুর অস্থিরতার আক্ষেপ নেই। রোজ বাড়ি ফিরে রাত্রে হরির মার কাছে যা রিপোর্ট পায় নীরদ। 'আমার সোনামণির মতন লক্ষ্মী ছেলে তিনভুবনে তুমি পাবে নাকি গো দাদাবাবু! উঁহুঁ। কোথায় গরম লাগছে দুশ্চিন্তায় তাড়াতাড়ি রান্না ফেলে ছুটে এসে আমি শুধোই, পাখা খুলে দেব বাবু, একটু গ্লুক্কুর (গ্লুকোজ) শরবত বানিয়ে দেব—তার উত্তর নেই, মিটিমিটি হাসি, পালটে আমায় বলে, কিনা, ইস্‌ কী বিশ্রী ঘামছ তুমি মাসি, ভাত চাপিয়েছ? ডাল ফুটছে? তা ফুটতে দাও না, ততক্ষণ তুমি এ-ঘরে পাখার নিচে বসে একটু জিরোও। শুনছ আমার চাঁদের কথা, এট্টুখানি দুধের বাচ্চার বুকে কত মমতা!' বলতে-বলতে

হরির মার চোখে জল দাঁড়ায়। নীরদ আর কিছু প্রশ্ন করে না। গম্ভীর হয়ে অফিসের জামাকাপড় ছাড়ে। কিন্তু হরির মা সেখানে থামে কি। 'কান্নাকাটি করবার জ্বালাতন করবার ছেলে আমার মানিক! পুতুলের মতন সারাদিন চুপটি করে শুয়ে আছে, জানালার পাখি দেখছে, ঐ-যে আবার একটা রংচং ছবি-ছাপা বই এনে দিলে, শিয়রের কাছে রাখে, আমি ও-ঘরে কাজকম্মে থাকলে ওটা চোখের সামনে তুলে নিজের মনে নাড়াচাড়া করে, এই তো করছে সারাদিন, এট্টু শব্দ আছে মুখে? আমি কান পেতে থাকি। দেয়ালে-দেয়ালে টিকটিকি ডাকে—আমার সোনার চাঁদের তো টুঁ আওয়াজটি শুনিনে। এমন ঠাণ্ডা, এমন লক্ষ্মী।' তারপর আরম্ভ হয় হরির মার শোক : 'কত জম্মের পুণ্যি করলে এমন চাঁদের টুকরো গভ্‌ভে (গর্ভে) আসে, আর সেই চাঁদ ফেলে বোনটি আমার হেসেখেলে দিব্যি চলে গেল ও-হো-হো, এই দুখ্যু আমি কেমন করে সইব গো—' 'এই চুপ চুপ।' নীরদকে ধমক দিয়ে হরির মার বিলাপ থামাতে হয়। তার ছেলে শান্ত; অসুস্থ বটে কিন্তু তার জন্য এতটুকু বেগ পেতে হয় না বোঝাতে গিয়ে হরির মা বরাবর এমন অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে। 'প্রতিমার আর-এক সংস্করণ তার এই ঝি—' যেন নিজের মনে কথাটা বলে নীরদ এখন মৃদু হাসল। শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে ছুঁড়ে ফেলে একটু সময় সে চোখ বুজে রইল। শরীরের এই অবস্থা তার ওপর সারাটা দিন একলা বিছানায় শুয়ে কাটানো, এটা-ওটা নিয়ে আবদার-অভিমান করা অস্বাভাবিক না, বিশেষ এই বয়সের ছেলের,—কিন্তু তার বাবু তাও করে না। ছেলের চিকিৎসা পথ্য শুশ্রূষা আরাম ইত্যাদি সম্পর্কে নীরদ যেমন সচেতন তেমনি ওর মন যাতে ভালো থাকে, ক্লান্ত বিমর্ষ না হয়ে পড়ে সেদিকে নীরদের প্রখর দৃষ্টি। খেলনা, ছবির বই, গল্পের বই, বোতলে জিয়ানো রঙিন মাছ, ফুল—যখন যা মনে হচ্ছে, চোখে পড়ছে নীরদের, দোকান থেকে কিনে নিয়ে বাবুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দু-পায়ের ওপর কবে ও সোজা হয়ে দাঁড়াবে, বিছানা ছেড়ে নিচে নেমে হাঁটবে স্থিরতা নেই,—হয়তো আর হাঁটবে না কোনোদিন মনে হওয়া সত্ত্বেও নীরদ সেদিন সতেরো টাকা দিয়ে ছেলের জন্য নতুন ডিজাইনের স্যু কিনে নিয়ে গেছে। বাবু খুশি হয়েছে জুতো দেখে। দু-তিনবার ওটা বুকের কাছে তুলে নাড়াচাড়া করে পরে শিয়রের পাশে রেখে দিয়েছে। 'আমি শিগ্‌গির হাঁটতে পারব তুমি বলছ বাবা?' 'নিশ্চয়ই,' নীরদ তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে। 'ঠাণ্ডাটা কমুক, শীত-কালে এমনি তো, আমরা যাকে বলি সুস্থলোক কাবু হয়ে পড়ি,—ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে না হোক, মাঝামাঝি, শেষদিকে তো বটেই—হাঁটতে না পারলেও তুমি উঠে বসতে পারবে। সুধাংশু কালও আমায় বলছিল। তারপর তো সামার—গ্রীষ্মকাল, প্রচুর রৌদ্র, প্রচুর হাওয়া, মানুষের হাত-পা তখন আপনা থেকে সজীব হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে—সুধাংশু বলে, বাবু সে-সময় হাঁটবেই, তাছাড়া এখন যখন একটা নতুন ইঞ্জেক্‌শান দেওয়া হচ্ছে। আর ভয় নেই।' কথা শেষ করে নীরদ হেসেছে। বাবু হাসে নি। বড়-বড় চোখ দুটো মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে কি ও বুঝতে পেরেছিল, নীরদ চিন্তা করে। ফাল্গুন গেছে, চৈত্র গেছে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়ও এসে গেল। যেমন ছিল তেমনি আছে। উঠে বসবার আগে হাঁটু দুটো তো গুটোতে পারা চাই, কিন্তু সেই শক্তি বাবুর কোথায়! হ্যাঁ, ও বুঝতে পেরেছিল বলেই বাবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল। তিন বছর শুয়ে আছে, তিন মাসের মধ্যে এমন-কিছু তার স্থাস্থ্যের পরিবর্তন হবে না যে,—

কিন্তু তবু নীরদকে বলতে হয়েছিল, বলতে হচ্ছে। সে নিজেই যদি আশার আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে তো ঐটুকুন ছেলে,—'তার শরীরে তুমি বল যোগাতে না পার

মনোবল তো ভেঙে দিতে পার না। সেই অধিকার তোমার নেই,—আমার নেই,'—চিন্তা করে নীরদ পরশুদিন আবার ছেলের জন্য নতুন একসেট জামাকাপড় কিনে নিয়ে গেল।

আজ ভোরে হঠাৎ ছেলের কথা শুনে নীরদের মন খারাপ হয়ে গেছে। এমন নয় যে তখনকার মতন খারাপ হয়েছিল,—চটপট তার প্রতিবিধান করে মনটা চাঙ্গা করতে পেরেছে। হ্যাঁ, প্রায় তিন মাস আগের কথা। নীরদ অবাক হয়, কী করে নিজে সে ভুলে আছে বলে নয়, বাবু ভুলে না-গিয়েও কথাটা কেমন করে চেপে আছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর একদিনও বাবাকে সে বলল না কেন ভেবে। 'কেন বলে নি?' একটা সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা নীরদের দুই ভুরুর মাঝখানে সেই সকাল থেকে ঝুলে আছে। জিজ্ঞাসার সঙ্গে অনুশোচনা, চাপা একটা বেদনা বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে সে আজ সারাদিন চলাফেরা করেছে, কাজকর্ম করেছে। একটু-একটু করে ব্যথাটা বড় হয়ে এখন বিবর্ণ ধূসর দিনের শেষে অফিসের প্রায়ান্ধকার এই নির্জন কামরায় নীরদকে বড় বেশি পীড়িত করে তুলল। রুমালের কোণা দিয়ে আর একবার সে চোখ মুছল। বাইরে যাওয়া। বাবুকে নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে মাস দু-তিন থাকা। 'তুমি কি অফিসে ছুটি পাচ্ছ না, বাবা?' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নীরদ শুধু ঘাড় নেড়েছে। মুখে কিছু বলে নি। কী বলবে? 'কে!'

পুস্-ডোর নড়ে উঠতে নীরদ চমকে উঠল, তারপর সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, 'আই সী।'

মিস্ ভৌমিক। রাণু ভৌমিক টেবিলের ওপর হাতের থলেটা রেখে উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসল। 'চুপচাপ বসে আছেন।'

'শরীরটা ভালো না।' নীরদ হাই তোলার ভঙ্গিতে একটু বড় করে হাসল, 'আপনি এখনও অফিসে?'

রাণু ভৌমিক হাসল না। মুখখানা গম্ভীর করে আস্তে-আস্তে বলল, 'আমার মনটা ভালো না মিস্টার সান্যাল।'

অফিসের চ্যাটার্জি-সাহেবের স্টেনোগ্রাফার। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তবে দেহ এখনও আঁটসাঁট। পুরুষের মতো ছোট করে ছাঁটা চুল। রুজ-পাউডারের প্রলেপমণ্ডিত মুখখানা দেখলে ত্রিশের কাছাকাছি বয়স বলে কেউ-কেউ ভুল করতে পারে মিস ভৌমিককে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে গলার চামড়ার একটি-দুটি ভাঁজ এবং কপালের দুটো-একটা রেখা চোখে পড়ে। তখন আর বয়স সম্পর্কে ভ্রম হয় না। তাছাড়া চোখের নিচের পাড় একটু-একটু করে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, প্রসাধন দিয়ে রাণু ভৌমিক তা কিছুতেই ঢাকতে পারছে না।

'কেন হঠাৎ মন খারাপ?' নীরদ প্রশ্ন করল, 'চ্যাটার্জি-সাহেব রওনা হয়ে গেছেন?' ইচ্ছা করেই নীরদ এটা যোগ করল, এবং রাণুর চোখ পরীক্ষা করতে লাগল।

'চ্যাটার্জি চলে গেছে বলে মন খারাপ বলতে চান?' রাণু নীরদের চোখ দেখল। 'তা বলতে পারেন, লিফ্‌টে মিঃ ঘোষালের সঙ্গে দেখা, তিনিও তাই বললেন, সবাই বলবে, অফিসের বেয়ারা দারোয়ানরাও বলবে চ্যাটার্জি একমাসের জন্য সিঙ্গাপুর অফিসে চলে গেছে রাণু ভৌমিক পৃথিবী অন্ধকার দেখছে।'

নীরদ ক্ষীণ শব্দ করে হাসল। 'প্লিজ এক্সকিউজ মি, হ্যান্ড এ স্মোক মিস ভৌমিক।' নীরদ সিগারেটের টিনটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। রাণু একটা সিগারেট তুলে নেয়। নীরদ লাইটার জেবলে রাণুর সিগারেট ধরিয়ে দেয়। 'ধন্যবাদ।' বলে রাণু আবার চুপ করে

থাকে। হঠাৎ মনে হতে হাত বাড়িয়ে নীরদ সুইচটা টিপে দেয়। ঘরের বিমর্ষ অন্ধকার দূর হয়ে আলোর বন্যায় চারদিক হেসে ওঠে। কিন্তু নীরদ দেখে চমকে উঠল রাণুর চোখের কোণায় একফোঁটা জল মুক্তা হয়ে টলমল করছে।

'কী ব্যাপার?' প্রশ্ন করতে গিয়ে নীরদের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। হা করে শুধু তাকিয়ে রইল।

আর একটু সময় কাটে। তারপর সিগারেটের ছাই ঝাড়বার আছিলায় রাণু টেবিলের অ্যাসট্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীরদের দিকে গলা বাড়িয়ে দেয়। জলের ফোঁটাটা টুপ করে টেবিলের বনাতের ওপর ঝরে পড়ল।

'ট্রু লভ প্রকৃত ভালোবাসার কোনো মূল্য আছে আপনি বিশ্বাস করেন মিস্টার সান্যাল?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন?' নীরদ হাসি চাপতে ঠোঁট টিপল।

'না এমনি, মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর রাণুর, কিন্তু ভারি মিষ্টি শোনাল।

নীরদ চুপ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে রাণু সোজা হয়ে বসল। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা নিজের মনে জ্বলছে। আনত চক্ষুপল্লব। যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন নীরদ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি এয়ারোড্রোম পর্যন্ত গিয়েছিলেন, মানে চ্যাটার্জি-সাহেবকে সী অফ করতে?'

'হ্যাঁ, এই তো ফিরলাম দমদম থেকে।' হাতঘড়ি দেখল রাণু ভৌমিক। 'আধঘণ্টা আগে আমি ফিরেছি। অফিসে ফেরার ইচ্ছা ছিল না। কাজ নেই কিছু। কিন্তু কোথাও আর যেতে ইচ্ছা হল না।'

তাই এলাম আবার কাচের বেড়াঘেরা চ্যাটার্জি-সাহেবের শূন্য কামরায়। যেখানে অনেক স্মৃতি অনেক রঙ এখনও জ্বলজ্বল করছে। চিন্তা করে মনে-মনে হাসল নীরদ। কিন্তু মুখ বুজে রইল।

'আমার কার্টেসি আমার কাছে, আমি তো অভদ্র হতে পারি না! কাজেই দমদম পর্যন্ত ছুটে গেলাম।'

নীরদ বুঝল আঘাত কোনদিক থেকে এসেছে। কিন্তু সাহস করে কিছু প্রশ্ন করতে পারল না।

'আমি অবাক হয়ে গেছি লোকটার ডুপ্লিসিটি দেখে, আগে তা বুঝি নি, এখন বুঝছি, আজ বুঝলাম, দমদম যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে ওর কনফেশান শুনতে হল।' উত্তেজনায় রাণু ভৌমিকের শরীর কাঁপছে, নীরদ অনুমান করল। 'কাওয়ার্ড কাওয়ার্ড,—চ্যাটার্জি যে এত ভীরু এমন মীন্ আমি কি জানতাম মিস্টার সান্যাল।' চোখের কোণায় আবার জল মুক্তা হয়ে টলমল করে। রাণু ভৌমিক এবার বাঁ-হাতের ছোট্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

'কি ব্যাপার বলুন তা!' নীরদ খুব অবাক হল না তবু অবাক হবার ভান করে ভুরু কুঁচকোল। 'কাল তো বোম্বে থেকে টেলিগ্রাম এল, সিঙ্গাপুর অফিসের কাজে গণ্ডগোল হয়েছে, চ্যাটার্জি-সাহেবকে আজ পাঁচটার প্লেনে স্টার্ট করতে হচ্ছে। তাই না?'

'তাই।' একটু অতিরিক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে রাণু ভৌমিক ঘাড় নাড়ল। 'সিঙ্গাপুরের অফিসে গণ্ডগোল হচ্ছে কিনা জানি না, তবে চ্যাটার্জি ইচ্ছা করে একমাসের জন্য এখান থেকে

সরে পড়ল।'

নীরদ চোখ গোল করে রাণু ভৌমিককে দেখে। পরে আস্তে-আস্তে বলে, 'আমি যে টেলিগ্রাম দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি।' রাণু ভৌমিক এবার লাল ঠোঁট সরু করে সিগারেট টানে। 'চ্যাটার্জি কাল খাম খুলে প্রথম আমাকে দেখিয়েছিল।'

'তবে আর কি।' নীরদ সান্ত্বনার সুরে বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলতে না পেরে ঠোঁট দুটো নাড়ে।

'টেলিগ্রাম-ফেলিগ্রাম ছেড়ে দিন মিস্টার সান্যাল,—ওর কনফেশান, গাড়িতে বসে নিজের মুখে আমাকে যা বলল তাই সত্য,—এবং কথাগুলো বিশ্বাস না-করারও কোনো কারণ দেখছি না।'

'কি?'

'আমি তার ফ্যামিলি-লাইফ নষ্ট করে দিচ্ছি, আমি—'

'অ্যাদ্দিন পর এ-কথা!' নীরদ এবার সত্যি অবাক হল।

'আমায় শেষ করতে দিন সান্যাল। আপনাকে কথাগুলো বলতে আমি দমদম থেকে ছুটে আবার অফিসে ঢুকেছি। এখানে যদি কেউ সোবার লোক থাকে—আপনি, আপনি উইডোয়ার, একটি মেয়ের দুঃখ আপনি—'

'ঠিক আছে, আপনি বলুন।' নিজের প্রশংসা শুনতে নীরদের চিরদিন সংকোচ। 'হ্যাঁ—চ্যাটার্জি বলল এ-কথা!'

'তাঁর স্ত্রী, সে চাইছে না আমার সঙ্গে চ্যাটার্জির মাখামাখি—'

'মাই গড্—তিনি কি করে—'

'দেখেছে, সেদিন চ্যাটার্জি তার মিসেসের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবে বলে একটা হোটেলে আমাকে নেমন্তন্ন করল—'

'কেন তা করত গেল।' নীরদ গলার একটা শব্দ করে বিড়বিড় করে উঠল, 'ফুল্।'

'বাহাদুরি দেখুন না, আমি তো ভাবলাম স্ত্রী তার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, না হলে অফিসে আমি তার স্টেনো, কিন্তু বাইরে তো বান্ধবী,—স্ত্রীর সঙ্গে কোন পুরুষ বান্ধবীর পরিচয় করিয়ে দেয়, বিশেষ আমাদের সমাজে—যার সাহস আছে, স্ত্রীকে যে শাড়ি-গয়না দিয়ে হোক চোখ রাঙিয়ে বা সত্যিকারের পৌরুষ দিয়ে মুঠোর মধ্যে রেখেছে, রাখতে পেরেছে, তারই এসব সাজে। যাকগে—আমি তো ভাবলাম মিসেসকে দিয়ে চ্যাটার্জির এক ফোটা ভয় নেই, আর চ্যাটার্জির স্ত্রীও আমার সঙ্গে বেশ ভালো করে কথাবার্তা বলল তখন, চ্যাটার্জি মদ খেল, আমিও একটু শেরী চাখলাম—চ্যাটার্জির বৌ একটা ভিমটো খেল—'

'তারপর?'

'তারপর হয়ে গেল—' রাণু ভৌমিক রুমাল দিয়ে কপাল মুছল। 'বাড়ি গিয়ে বৌ নাকি ভীষণ লাফালাফি করেছে, কাঁদাকাটি করেছে, আর চ্যাটার্জিকে শাসিয়েছে যদি আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ না করে তবে সুইসাইড করবে।'

নীরদ গম্ভীর হয়ে রইল।

'ঐ তো দেখলাম কালীঠাকরুণের মতো চেহারা; আমার তো এমন গা-বমি করছিল দেখে—থুঃ—' যেন থুথু ফেলতে রাণু ভৌমিক এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে পরে সুবিধামতো পাত্রপাত্র না পেয়ে অগত্যা সেটা গলাধঃকরণ করে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল।

'আজ কি বলছিল চ্যাটার্জি?'

'বাড়িতে আজ পনেরো দিন ধরে ভীষণ অশান্তি যাচ্ছে—কিছুতেই তিষ্ঠোতে পারছে না, আপাতত সিঙ্গাপুর গিয়ে একমাস থাকবে,—চাকরি তো আর ছাড়তে পারে না, সেখানে গিয়ে লেখালেখি করে বোম্বে মানে হেড-অফিসে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যেতে পারে কিনা তার চেষ্টা করবে।'

'ফ্যামিলি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল,' রাণু ভৌমিকের চোখ দুটো অসম্ভব চকচক করছিল, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র—ছোট ফাঁপানো চুলে সাংঘাতিকরকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'পরিবারের জন্যেই তো এতসব কাণ্ড—আমার সঙ্গে আর মিশতে না হয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাই মানে-মানে এখান থেকে সরে পড়ল—ছেলে ও বৌকে আপাতত বালিগঞ্জে শালার বাড়িতে রেখে গেছে—পরে সুবিধে মতন নিয়ে যাবে—'

এরপর কী বলা যায় নীরদ চিন্তা করছিল।

রাণু ভৌমিক বলল, 'এর আগে ঐ যে দিন কতক এই অফিসে ছিল, কি নাম, আপনি দেখেছেন,—'

'বোস?' নীরদ বলল, 'অরুণ বোস,—'

রাণু ভৌমিক মাথা নাড়ল, 'দিল্লী অফিস থেকে এসেছিল। চমৎকার হার্ট লোকটার—কি, আপনার কাছে বলতে আমার সংকোচ নেই,—অরুণ আমার দিকে ঝুঁকেছিল, একটু বেশিই ঝুঁকেছিল,—মাত্র কয়েকদিনের তো পরিচয়—কিন্তু চ্যাটার্জির চোখে তা ভালো লাগে নি,—একদিন তো আমাকে পষ্টাপষ্টি বলেই দিলে,—'

'আপনি শুনলেন চ্যাটার্জির কথা?'

'না শুনে করব কি—অরুণ এই অফিসের টেম্পোরারি হ্যান্ড, গেল এক কথা, দু-নম্বর, আমি চ্যাটার্জির স্টেনো,—কিন্তু আমি কি জানি, আমি কি জানতাম চ্যাটার্জি শেষপর্যন্ত এমন করবে,—কাওয়ার্ড মীন্—উঃ—'

আর-একটু সময় কাটে। নীরদ হাতঘড়ি দেখে। রাণু ভৌমিক নীরব আনতমুখী। টুপ করে আর একফোটা জল টেবিলের ওপর ঝরে পড়ল। সান্ত্বনা দিতে নীরদকে মুখ খুলতে হল, 'তা চ্যাটার্জি যখন নিজে থেকে সরে পড়েছে, একরকম মন্দ হল কি মিস ভৌমিক,—আপনি এখন স্বাধীনভাবে—'

নীরদের কথা অসমাপ্ত থেকে গেল। একটা বিস্ফোরণের মতো হঠাৎ রাণু ভৌমিকের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল, 'হোয়াট!' ওর চেহারা দেখে নীরদ ভয় পেল। 'আমার ভালোবাসার কোনো দাম নেই—অ্যাঁ, আমি, আমি কি একটা—উঃ—তবে আজ আপনাকে বলছি সান্যাল, আয়ার-সাহেব আমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, হ্যাঁ, আপনাদের চাঁফ একাউন্টেন্ট, সারাদিন তো মুখখানা এমন গোমরা করে আছে, দেখলে মনে হয় না টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু তার পছন্দ—আয়ারের একডজন চিঠি আপনাকে দেখাতে পারি—'

'তারপর?' ফ্যালফ্যাল করে নীরদ রাণু ভৌমিকের মুখ দেখে।

'তারপর আর কি,' রাণু ভৌমিক দাঁতে দাঁত ঘষল, 'দ্যাট্ স্কাউন্ড্রেল, দ্যাট্ চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করল, হ্যাঁ, পর্যন্ত অফিসের কাজ নিয়ে,—একটা চিঠি সাতবার করে টাইপ করিয়েও তাতে ভুল বার করবার জন্যে ও উঠেপড়ে

লেগে গেল।'

নীরদ এবার ক্ষীণ গলায় হাসল।

'আপনি হাসছেন,' রাণু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে আর্ত অসহায়ের মতো একবার নীরদের চোখের দিকে তাকায়, 'তারপর, কেন, আপনাদের চক্রবর্তী-সাহেব কি,—এমনি তো আমার মেয়ে, আমার ছেলে আমার ওয়াইফ ছাড়া অফিসে কারো সঙ্গে কথাই বলেন না, তিনি আমার সঙ্গে ভাব করতে চান নি? একদিন? কমসে-কম আট দিন আমার বৌবাজারের বাসায় গাড়ি নিয়ে গেছেন, 'সিনেমায় চল মিস ভৌমিক, নয়তো এসো কোথাও খাব একসঙ্গে দুজন।'

'গেলেন, গিয়েছিলেন এক-আধদিন?' আর সংকোচ করা বৃথা মনে করে নীরদ সরাসরি প্রশ্ন করল।

রাণু ভৌমিক ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, অনুচ্চ রুদ্ধ গলায় উত্তর দিল, 'না যাই নি, সাহস পাই নি চক্রবর্তীর সঙ্গে হোটেলে সিনেমায় বেরোতে, চ্যাটার্জির সঙ্গে তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি—' রাণু ভৌমিক একবার থামল, তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল, 'এমনভাব ও আমার সর্বনাশ করল!'

নীরদ অপ্রস্তুত। 'ছি, আস্তে, মিস ভৌমিক, বেয়ারা দারোয়ানরা এখনো ঘোরাঘুরি করছে—শুনুন—'

কান্নার শব্দ রুদ্ধ হল, কিন্তু কান্না থামল না। গালে-চোখে জল নিয়ে রাণু ভৌমিক মুখ তুলল, 'আপনি কী বলছেন, আমায় এমনভাবে যে চিট্ করল আমি তার প্রতিশোধ নেব না! আমার, আমার ভালোবাসার কি কোনো দাম নেই—বলুন!' নীরদ হতভম্ব, এবার রাণু ভৌমিকের প্রত্যেকটা কথা তীরের মতো এসে তার বুকে বিঁধছে। যেন যন্ত্রণায় তার মুখ নীল হয়ে গেল।

চার

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী স্কোয়ারের মোড়ে একটা চীনা রেস্টুরেন্টে দুই বন্ধু ঢুকে পড়ল। পরিচিত জায়গা। বয়-রা বাবু দুটিকে চেনে। কোণার দিকের পার্টিশান-ঘেরা ছোট কামরাটি সুধাংশুর প্রিয়। সেদিকে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করা মাত্র মজিদ নামক অল্পবয়স্ক পরিচারকটি মাথা নেড়ে বলল, 'হুজুর, খালি আছে, চলুন।' সুধাংশু চোখের ইঙ্গিত করতে নীরদ তাকে অনুসরণ করল।

চটপটে হাতে মজিদ আলো জেলে দিল, পাখা খুলে দিল, তারপর ফুল-পাতা-আঁকা সুদৃশ্য একটা ঢাকনা টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাবুদের মুখ পরীক্ষা করতে লাগল। 'ইদিকে এসো,' সুধাংশু নীরদকে ডাকল। মুখোমুখি না বসে দুজন পাশাপাশি বসল। রুমাল দিয়ে সুধাংশু কপালের ঘাম মুছল, নীরদ রুমাল দিয়ে ঘাড় ও গলাটা বেশি করে মুছল।

সুধাংশু আড়চোখে নীরদের দিকে তাকায়, 'হুইস্কি?'

নীরদ মাথা নাড়ল।

'রাম্?'

নীরদ মাথা নাড়ল।

'ব্র্যান্ডি?' সুধাংশু ফের প্রশ্ন করল।

নীরদ মাথা নেড়ে বলল, 'নু—নাঃ—আমাকে ঐ একটা বিয়ার-ফিয়ার দিতে বল—শরীরটা তেমন ভালো নেই।'

সুধাংশু ভুরু কুঁচকোল। 'স্ট্রেঞ্জ—কেন বিয়ার খাওয়ার কি হয়েছে, শরীর খারাপ অর্থ কি। ও কিছু না, ডাল্ ওয়েদার,—আমারও তো শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।' সুধাংশু ঘাড় তুলে মজিদের দিতে তাকাল। 'হুইস্কি।' ঘাড় নেড়ে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল এবং দু-মিনিট পর গ্লাস, সোডা ও মদের বোতল নিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল।

দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে সোডার বোতলের ছিপি খুলে দিয়ে মজিদ আবার বাবুদের মুখ পরীক্ষা করে।

'কিছু খাবে?' সুধাংশু বন্ধুর দিকে তাকায়।

নীরদ মাথা নাড়ে। 'কি দরকার, একটু চানা-টানা বলে দাও।'

কিন্তু সুধাংশু তা শোনে না। বয়কে কি-যেন বলে।

বয় ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়।

সুধাংশু সিগারেট ধরাল। নীরদ সিগারেট না ধরিয়ে দু-আঙুলের মধ্যে সেটা গুঁজে রেখে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। রাশি-রাশি চেরিফুল ফুটেছে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে একটি মেয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাসছে। জাপানী তরুণী।

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে নীরদ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে সুধাংশু প্রশ্ন করল, 'খুব একটা চিন্তা করছ কিছু মনে হচ্ছে।'

'মনটা ভালো নেই।' নীরদ সিগারেট ধরাল। তারপর সুধাংশুর দেখাদেখি গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে সিগারেট টানতে লাগল।

'মন ভালো না ভালো না সর্বদাই বলছ। কিন্তু আমি তো আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছি না,—অবশ্য তোমার মন খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক—' চোখ বুজে একটু চিন্তা করে সুধাংশু পরে বলল, 'তা তুমি যদি বল আমি আবার কোনো স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করতে পারি,—কিন্তু—'

'তাতে কিছু লাভ নেই,' নীরদ ঘাড় নাড়ল, ঘাড় নেড়ে মদের গ্লাসে চুমুক দিল, একজনকে তো আর দেখান হয় নি, তিন-তিনটে স্পেশালিস্টকে দেখান হয়েছে, এবং তাদের—'

'সবাই একরকম রায় দিয়েছে, এই তোমার ছেলের ডিজিজ, এই তার ট্রিটমেণ্ট,—কাজেই—' সুধাংশু কথা শেষ না করে মৃদু হেসে ইঙ্গিতে বক্তব্য সম্পন্ন করল।

বয় খাবার নিয়ে এল।

'যাও, পিছু বুলায়েঙ্গে।' নীরদ হঠাৎ হিন্দী বলতে চেষ্টা করল।

মজিদ অল্প হেসে ঘাড় নেড়ে সরে গেল।

'কাজেই মন খারাপ করে লাভ নেই।' সুধাংশু বলল, 'আর কি খবর বল,—ওটি কে হে চোখ মুছতে-মুছতে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে গেল?'

'মিস ভৌমিক—আমাদের অফিসের চ্যাটার্জির স্টেনো।' নীরদ গম্ভীর থেকে কাঁটা-চামচ বাগিয়ে মাংসের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'বাঙালী, আমি তো ভাবলাম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুঝি।' সুধাংশু গরম মাংস ছিঁড়ে মুখে পুরল।

'কি হয়েছে, খুব যেন কাঁদাকাটা করছিল। চাকরি গেছে?'

নীরদ কথা বলল না।

'তা ওদের চাকরি গেলেও আবার চট্ করে জুটে যায়—ওদের চাকরির অভাব হয় না।'

'কেন,—এ-কথা বলছ কেন?'

প্রশ্ন করার সময় নীরদ হঠাৎ চোখমুখের এমন ভঙ্গি করল যে সুধাংশু চমকে উঠল। সুধাংশু অবশ্য সরলভাবেই কথাটা বলছিল। কিন্তু নীরদের রুক্ষ স্বর তার ভালো লাগল না। তাই ইচ্ছা করে 'শর্টহ্যান্ড জানা আছে—অফিসে কাজ পেতে কষ্ট হবে না' না বলে মোটা গলায় বলল, 'ককেট,—এমন চুল-কাটা আর অমন ব্লাউস-গায়ে মেয়েগুলো ওভারনাইট চাকরি যোগাড় করতে পারে।' সুধাংশু গ্লাস তুলে লম্বা চুমুক দিল। গ্লাস নামিয়ে রেখে হা-হা করে হাসতে লাগল।

'হেসো না, প্লিজ ডোণ্ট লাফ্।' নীরদ রাগ করে ছুঁড়ে ফেলার মতন হাতের কাঁটা-চামচ রেখে দিল। 'মিস ভৌমিক বিশেষ ধরনের ব্লাউজ গায়ে দিতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে এরকম ধারণা করবে না।'

সুধাংশু নাছোড়বান্দা। 'আমি জানি অফিস-পাড়ার ওসব মেয়েদের।' সুধাংশু এবার মদের গ্লাসের আড়ালে মিটিমিটি হাসে।

'ননসেন্স।' নীরদ প্রথমটায় বিড়বিড় করে, তারপর আর এক ঢোক গিলে চোখ বড় করে বন্ধুর দিকে তাকায়। 'একটা কথা বলি, রাগ কর না, অফিস বা অফিস-পাড়া সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া নেই। বাপের টাকায় ডাক্তারী পড়ে পাশ করেছ, বড়লোক শ্বশুরের টাকায় ডিস্‌পেন্সারী খুলেছ—কাজেই যাদের জান না, যাদের সঙ্গে কথা বলার মেশার সুযোগ হয় নি তোমার, তাদের সম্পর্কে একটু সাবধানে কথা বলবে।'

কিন্তু সুধাংশু তথাপি, বিশেষ নীরদ ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে লক্ষ্য করে, মাথাটা আরো জোরে নেড়ে-নেড়ে মিটিমিটি হাসে, 'এ ককেট—'

'ইউ শাট্ আপ্।' নীরদ চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু সুধাংশু নির্বিকার, নিরুত্তেজ। শূন্য গ্লাস দুটো লক্ষ্য করে গম্ভীর গলায় ডাকল, 'ব্-য়,'—তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পরে ডাকল, 'মজিদ—'

মজিদ ছুটে আসতে সুধাংশু বলল, 'পেগ লে আও।' তারপর বন্ধুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে, 'বসো, বসো, অত উত্তেজিত হবার কি আছে। আমি যদি বলি তার সাজপোশাক, শরীর, হাঁটা এবং চাউনি বলছিল মেয়েটা ভালো নয়,—তো আমার দোষ হবে কি,—আমার যা ইম্‌প্রেশান হল তোমার মিস ভৌমিককে তখন দেখে—।'

'ভা-লো না—' যেন আর তর্ক করা বৃথা, এই নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে কিছু বোঝাতে যাওয়া অর্থহীন, মুখের এমন ভাব করে নীরদ আস্তে-আস্তে চেয়ারে বসে পড়ল। ইতিমধ্যে মজিদ বোতল নিয়ে এল, দুটো গ্লাসে পেগ্ ঢালা হল, নতুন সোডার বোতল খোলা হল, কিন্তু নীরদ মাথা তুলল না। দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল। হঠাৎ এই পরিবর্তন সুধাংশুর কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকল। 'এই নীরদ, নাও ভাই,—চট্ করে এটা শেষ করে চল উঠি।' নীরদের পিঠে হাত রাখল সুধাংশু, 'রিয়্যালি, আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে কিছু বলি নি। তুমি তর্ক করলে আমি তাই—' কিন্তু নীরদ নিরুত্তর। পাশের কোন কামরায় একটা মেয়ে খিলখিল হাসছে। একটি পুরুষকণ্ঠ কি-একটা ইংরেজি গানের কলি ভাঁজছে।

উত্তেজনার পর অবসাদ,—নীরদের অবস্থাটা তাই দাঁড়িয়েছে কিনা সুধাংশু চিন্তা করল। কিন্তু তেমন নেশা হবার মতন তো খাওয়া হয় নি,—তাছাড়া নীরদ আজ এই প্রথম

সুধাংশুর সঙ্গে মদ খেতে আসে নি। যখনই খাওয়ার ইচ্ছা হয় দুজন একসঙ্গে দোকানে আসে। সে তো আজ কতদিন হয়ে গেল! রোজ খাওয়ার পক্ষপাতী তারা কেউ নয়। দু-বন্ধুর মধ্যে এমন কথা হয়ে আছে একজন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখা গেলে আর-একজন তৎক্ষণাৎ রাশ টেনে ধরবে। ভদ্রলোকের মতন খাবে, ভদ্রলোকের মতন বেরিয়ে যাবে। মন খারাপ—আচ্ছা চলো, শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে—আচ্ছা চলো,—একসঙ্গে বসে দুজনে মন খুলে দুটো কথাও বলা যাবে, সময়টা কাটবে—এই, এর অতিরিক্ত কিছু তাদের ইচ্ছা নেই, রুচিও হয় না। আজ গোড়া থেকে নীরদকে যেন কেমন-একটু অস্বাভাবিক ঠেকছিল, সুধাংশু চিন্তা করল,—'তবে কি,'—সুধাংশু আড়চোখে নীরদকে দেখল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল তাই বা হবে কি করে, তাছাড়া এটা সুধাংশু কখনই ভাবতে রাজী নয় নীরদ এখানে আসার আগে কোথাও এক-আধটু খেয়ে-টেয়ে এসেছে। সুধাংশু বাইরে খুব চাপা—বেশি কথা বলা বেশি হাসা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সেই জন্যই ওপর থেকে দেখলে সুধাংশুকে 'নিরামিষ' 'নিরামিষ' মনে হয়। কিন্তু আসলে মানুষটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান চতুর এবং হুঁশিয়ার। সেই তুলনায় নীরদ কতকটা মোটাবুদ্ধির লোক। এবং সেই কারণেই হয়তো একটু সরল, ভাবপ্রবণ। মাঝখানে দু-বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। বেশি না—বছর চার-পাঁচ। নীরদ চাকরি নিয়ে কানপুর চলে যায়। তাছাড়া বলতে গেলে দুজন একসঙ্গে জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়ে এসেছে। সুধাংশু সাঁইত্রিশে পা দিয়েছে, নীরদের তাই হবে—বড়জোর সুধাংশুর চেয়ে এক-আধ বছরের বড় হতে পারে। টালিগঞ্জে থেকে দুজন বড় হয়েছে। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। পরে অবশ্য সুধাংশু ডাক্তারী পড়ল নীরদ পড়ল কমার্স। সুধাংশুর বাবা ছিলেন পি-এম-জি অফিসের মস্তবড় চাকুরে। টালিগঞ্জে জায়গা কিনে বড়সড় একখানা বাড়ি করে যেতে পেরেছেন। তিন বৎসর আগে তিনি পরলোকগত হয়েছেন। সুধাংশু টালিগঞ্জ থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে তার ডিস্‌পেন্সারীতে এসে বসে। ডিস্‌পেন্সারীর বাড়িটা তার এক শ্যালক খুঁজেপেতে বার করে দেয়। গোটা বাড়িটাই সুধাংশুর জিম্মায়। সে লীজ নিয়েছে। নিচেটা নিজের জন্য রেখে ওপরের ফ্ল্যাট দুটো সে ভাড়া দিয়েছে। নীরদের নিজস্ব কোনো বসতবাটি কলকাতায় নেই। টালিগঞ্জে মামার বাসায় থেকে সে বড় হয়েছে—সেখানে থেকেই লেখাপড়া শেখা। মামা ভাড়া-করা বাড়িতে জীবন কাটিয়ে গেছেন। সামান্য চাকরি করতেন কোন এক মার্চেণ্ট অফিসে। শৈশবে নীরদ বাপ-মা হারিয়ে শিলচর না শিলং থেকে চলে এসেছিল মামার আশ্রয়ে,—তার আর কোনো ভাইবোনও নাকি ছিল না। মামার কাছে থাকলেও নীরদ অসহায় অনাথ এই বোধটা সুধাংশুর ছোটবেলায় যেমন ছিল আজও আছে। সেইজন্যই চিরকাল বন্ধুটির প্রতি তার এত মমতা। নীরদও সুধাংশুকে নিজের ভাইয়ের মতন মনে করে, উঠতে-বসতে সকল ব্যাপারে সুধাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করে। তাছাড়া বড়লোক বলে সুধাংশু একটা আশ্রয়ও বটে। কানপুর থেকে কলকাতায় এসে নীরদ সপরিবারে সুধাংশুর টালিগঞ্জের বাড়িতে উঠেছিল। দু-মাস পর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির ওপরের একটা ফ্ল্যাট খালি হওয়ামাত্র নীরদ সেটা পেয়ে যায়। তারপর তো নীরদের জীবনে কত বড়-বড় বিপদ এল। স্ত্রীর অসুখ, ছেলের অসুখ, স্ত্রীর মৃত্যু—তারপর ছেলের এই অবস্থা। বন্ধু সুধাংশু ছায়ার মতো নীরদের সঙ্গে-সঙ্গে আছে। আজ কদিন ধরেই নীরদকে সে একটু অন্যমনস্ক দেখছে। মাঝখানে কদিন দুজনের একসঙ্গে কোথাও বসা হয় নি। বাড়িতে একটু কাজকর্মে ব্যস্ত (সুধাংশুর এক ভাগ্নীর বিয়ে—টালিগঞ্জের বাড়িতেই শুভকর্ম হয়েছে) থাকার দরুন সুধাংশু ডিস্‌পেন্সারীতেও খুব কম

এসেছে। তা হলেও নীরদ যখন অফিসে বেরোয় কি অফিস থেকে বাড়ি ফেরে দু-চার মিনিটের জন্য যে সুধাংশুর সঙ্গে দেখা হয়নি এমন না, কিন্তু একটা-দুটো কথা—'বাবু, আজ কেমন আছে, টেম্পারেচার উঠেছিল কি,' অথবা 'তোমার ভাগ্নীর বিয়ে কবে, আমায় নেমন্তন্ন করছ বটে, কিন্তু যাওয়া হবে কি—মনটা ভালো নেই' ইত্যাদি ছাড়া আর বিশেষ কিছু কথা হয়নি। এবং তখনই সুধাংশু নীরদের অন্যমনস্কতা, কেমন যেন একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে। কোনো প্রশ্ন করেনি যদিও। কাল শুভকাজ হয়ে গেছে। আজ সকালেও সুধাংশু ব্যস্ত ছিল। দুপুরে বর-কনে বিদায় করে দিয়ে সুধাংশুর অবসর হয়েছে। বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে সোজা সে চলে আসে নীরদের অফিসে। হ্যাঁ, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে তখন। বাইরে গাড়ি রেখে সুধাংশু বারান্দায় দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট-এর জন্যে অপেক্ষা করছে—এমন সময় দুজন, নীরদ আর সেই মেয়েটি একসঙ্গে নিচে নামল,—লাল টুকটুকে একটা রুমাল দিয়ে মেয়েটি মানে নীরদের অফিসের মিস ভৌমিক চোখ মুছতে-মুছতে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে গেল। সুধাংশু নীরদকে গাড়িতে তুলে এখানে চলে আসে।

'এই নীরদ!' চাপা ধমকের সুরে এবার সুধাংশু বন্ধুকে ডাকল।

নীরদ মুখ তুলল। চোখ লাল হয়েছে। যেন একটু জলও জমেছে চোখের কোণায়।

'ছেলেমানুষি করছ—' সুধাংশু গম্ভীর গলায় বলল, 'কি হয়েছে আমায় বলতে বাধা আছে কি?'

'কিছু হয়নি—' নীরদ মাথা নাড়ল, ক্ষীণ হাসল, '—রিয়্যালি আমিও তর্কের খাতিরে বলছিলাম—না হলে—'

'আমি জানি, আমি জানতাম, মিস ভৌমিক যা-ই হোক, যে-কারণেই ও কাঁদুক, তোমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।'

'না, নেই।' নীরদ হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলল। 'লাস্ট পেগ্, আর খাব না আমি—'

'আমিও আর খাব না।' সুধাংশু হাতে গ্লাস তুলল। 'তবে এমন মুখ গুঁজে থেকে মন খারাপ করার অর্থ কি! কি হয়েছে?'

'বলব, বলছি।' গ্লাস রেখে দিয়ে নীরদ সিগারেট ধরাল। 'মিস ভৌমিক কাঁদছে চ্যাটার্জি তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেল। আমাদের অফিসের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সমর চ্যাটার্জি।'

'কোথায় গেল?'

'সিঙ্গাপুর, প্লেনে তুলে দিয়ে এসে মিস ভৌমিক আমায় বলছিল—'

'ফাঁকি দিয়েছে মানে, বিয়ে করার কথা ছিল? তোমাদের সমর চ্যাটার্জি বিয়ে করেনি?'

'অনেক দিন, ছেলে আছে বড়—' বলতে-বলতে নীরদ আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

সুধাংশু বলল, 'নাও, শেষ করে নাও।'

কথা না বলে নীরদ গ্লাস উপুড় করে অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ করল, তারপর সিগারেট টানতে লাগল।

সুধাংশু বয়কে ডেকে বিল আনতে বলল।

'বিয়ে করত কিনা জানি না, তবে চ্যাটার্জি সুখের পায়রাটি হয়ে যতটুকু আনন্দ লুঠবার লুঠে এখন উড়াল দিয়েছে—' নীরদ সুধাংশুর চোখে-চোখে তাকায়।

'এরা সমাজের যতটা ক্ষতি করছে—' সুধাংশু বিড়বিড় করতে-করতে পরে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি ডাক্তার,—তাহলেও বলছি টি বি ক্যান্সার একটা দেশকে জাতিকে অতখানি দুর্বল করে না, পঙ্গু করে না এরা যতটা করছে—'

'মিস ভৌমিকের দল?'

'মিস ভৌমিক, তোমার চ্যাটার্জি-সাহেব—আই কাণ্ট্ ব্লিম—একটা পুরুষ বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে, রেস্‌পন্সিবল পোস্ট নিয়ে এক জায়গায় কাজ করছে—আর সে কিনা—' ঘৃণায় বিদ্বেষে সুধাংশুর চোখমুখ কুঁচকে উঠল, 'একটা মিস ভৌমিক না, একজন চ্যাটার্জি না, এমন বহু চ্যাটার্জি-ভৌমিক সাজপোশাক ভদ্রতা কালচারের খোলস পরে লুকিয়ে-লুকিয়ে সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে?' বলতে-বলতে সুধাংশু একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি, আমার হাতে যদি আইন থাকত, পুলিশ থাকত এগুলোকে আগে গুলি করে মারতাম, জেলে পুরতাম—এদের অপরাধের তুলনায় আমি তো ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার চোর জালিয়াতদের সাধু মনে করি।'

নীরদ কথা বলল না। হা করে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশের কামরায় এবার নারীকণ্ঠ ককিয়ে উঠল : 'And I hate to see you go—o—o!'

'ইউ গো টু হেল্।' বলে সুধাংশু উঠে দাঁড়াল। বয় বিল নিয়ে আসে। পার্স খুলে সুধাংশু টাকা বার করে দেয়। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নীরদকে চেয়ার থেকে টেনে তোলে, 'চল, আর বসে থেকে কাজ নেই।'

গাড়িতে বসে দুজনের কথা হয় না। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নীরদ বসে থাকে। যেন ঘৃণা ও বিরক্তির ভাবটা এখনও সুধাংশু ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। মুখটা শক্ত, দৃষ্টি কঠিন, স্টিয়ারিং ধরে-রাখা হাত দুটো দৃঢ়। এ-সময় সেন্ট্রাল এভিন্যুতে ট্রাফিকের স্রোত বয়, গোঁ-গোঁ, সোঁ-সোঁ শব্দের ঝড় বইছে। যেন কথা বললেও শুনতে পাওয়া কষ্ট। ধর্মতলার মোড়ে এসে গাড়ি থামিয়ে সুধাংশু ঘাড় ফেরাল এবং প্রথম কথা বলল, 'গঙ্গার ধারে যাব?'

'না।' নীরদ হাতের ভিতর থেকে মুখ তুলল।

'তাহলে মাঠে একটু বসা যাক?'

'না।' নীরদ মাথা নাড়ল। 'তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি এখানে নামব।'

'কেন?'

'আমি ট্রাম ধরব।'

হাসল সুধাংশু।

'তা আগে বললে না কেন?'

নীরদ হাসল না।

সুধাংশু আর কিছু বলল না। না বললেও মুখ দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বার করল। কিন্তু নীরদ তা গ্রাহ্য করল না, 'চলি ব্রাদার—' বলে দরজা খুলে নেমে পড়ল। সুধাংশু বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ট্রামে এখন না-চাপাই ভালো,—বরং একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে যাও।'

'তাই যাব, তাই যাওয়া যা—বে—' বলতে-বলতে নীরদ ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

'কিছু একটা হয়েছে ওর।' স্টিয়ারিং-এ হাত রাখতে গিয়ে সুধাংশু চিন্তা করল। অন্যদিন হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে তারা এদিকে চলে আসে। নদীর ধারে যায়, কি

ওধারে স্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে দুজন মাঠে নেমে গিয়ে নিরিবিলি বসে গল্পগুজব করে, সিগারেট খায়। বেশি রাত হয়ে গেলে সুধাংশু আর নীরদকে বাড়ি পৌঁছে দিতে উত্তরদিকে গাড়ি নিয়ে ছোটে না। নীরদই নিষেধ করে। 'তুমি চলে যাও, বৌদি চিন্তা করবে—আমি বরং একটা ট্যাক্সি ডাকি।' 'তাই ডাকো।' সুধাংশু বন্ধুর কাছ থেকে হেসে বিদায় নেয়। কিন্তু আজ ব্যাপারটা অন্যরকম হল। 'কি হয়েছে ওর?' সুধাংশু ভাবতে-ভাবতে গাড়ি চালায়।

আর নীরদ ভাবছে, 'সুধাংশু আমার আবাল্য বন্ধু, একমাত্র বন্ধু, ওর কাছে সব খুলে বলা কি উচিত ছিল না, নিশ্চয় একটা পরামর্শ দিত। সে নিজে যখন বুদ্ধি ঠিক করতে পারছে না তখন—' ভাবনা হোঁচট খায় নীরদের। সুধাংশুর শক্ত বিকৃত চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। 'ভদ্রতা কালচারের খোলস পরে ওরা সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে, আইন আর পুলিশ হাতে থাকলে আমি এদের গুলি করে মারতাম, জেলে পুরতাম।' ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে নীরদ অগ্রসর হয়। যেন তার নিজের পায়ে জোর নেই। ভিড় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোনদিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। কেবল চোখের ওপর আলোর সারি মানুষের মুখ মাথা দোকান খেলনা জামাকাপড় ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম চামড়ার ব্যাগ বেতের চেয়ার দুলছে, আর একটি মুখ। রবারের পুতুলের মুখ না। সেই মুখের দীর্ঘপল্লব দু-চোখ কখনও কামনার শিখা হয়ে জ্বলছে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, ঘন গরম নিশ্বাস ঝরছে, কখনও হতাশার মেঘে মুখখানা বিষণ্ণ থমথমে,—ক্লান্ত করুণ চোখ বেয়ে এখনি ধারা নামবে। ভিতরের এক অপরিসীম যন্ত্রণায় নীরদের স্নায়ুগুলো আর্তনাদ করে উঠল। আলোর রাস্তা ছেড়ে সে ডানহাতি অন্ধকার গলিতে ঢুকল।

পাঁচ

দোকান। কিন্তু এক আশ্চর্য জগৎ! কে তাকে এখানে টেনে আনল অন্য সময় সে নিশ্চয় ভাবত। কিন্তু এখন তার সেই ভাবনা মনের ধারে-কাছে নেই দেখে নীরদ অবাকও হল। সারি-সারি বেঞ্চির ওপর কেউ পা তুলে বসে, কেউ পা নামিয়ে বসে। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে গেছে। কারো হাতে কাচের গ্লাস কারো হাতে মাটির ভাঁড়। টুকরো-টুকরো শালপাতায় রয়েছে আদা ছোলা নুন, কেউ নিয়েছে তেলেভাজা, সেদ্ধ-করা আলু, কেউ ভাঁড়ে করে ফুল্‌কা মেটুলি-চচ্চড়ি এনেছে। আর হৈ-হৈ চিৎকার। বিচিত্র ধরনের চেহারা বিচিত্র ধরনের বেশভূষা। লুঙিপরা, পায়জামা-পরা, ধুতিপরা, পেণ্টুলন-পরা। ছেঁড়া তালিমারা জামা আছে, খালি গা আছে, সদ্য পার্ট-ভাঙা শার্ট-পাঞ্জাবি আছে। এক-চুমুকে কেউ গ্লাস শেষ করছে, কেউ একটুখানি গিলে ওয়াক থুঃ করে মেঝে-বেঞ্চি নোংরা করছে, আবার গিলছে, আবার থুথু ফেলছে। বিকৃত মুখ, প্রসন্ন মুখ। কেউ গল্প করছে, কেউ চুপচাপ ধ্যানমগ্ন ঋষি হয়ে আছে। এক-পা এক-পা করে নীরদ কাউণ্টারের সামনে এগিয়ে গেল। যেন চুরি করছে এমনভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে মানুষগুলোর মুখ দেখল।

'কি চাই আপনার?'

'ঐ একটুখানি দিন।'

'কি দেব?'

'দিশী মদ।'

'ভালো জ্বালা।' মোটা ভুঁড়ি নাচিয়ে লোকটা হেসে উঠল। তারপর মুখ বিকৃত করল।

'হ্যাঁ, এটা দিশী মদের দোকান বটে, এখানে বিলিতি নেই,—ক-নম্বর চাই আপনার? এক দু তিন? ক-আউন্স্? পাইট ওধারে।'

'একনম্বর দিন। পাঁচ আউন্স।' সামনে একটা খালি গ্লাস পেয়ে নীরদ সেটা সামনে বাড়িয়ে দেয়।

'এক টাকা পাঁচ আনা দিন।' মোটা লোকটা এতবড় এক মেজার গ্লাসের মুখে ছাকনি বসিয়ে মদ ঢালে। নীরদ পকেট থেকে টাকা বার করে দেয়।

গ্লাস হাতে নিয়ে একবার সে ভাবল সোডা নেবে কি! শুনেছে এ-জিনিস বড় কড়া, বিশ্রী স্বাদ। কিন্তু ভাবতে-ভাবতে সে সোডার কথা ভুলে গেল। গ্লাস তুলে একটা চুমুক দিল। জিহ্বা পুড়ে যায়, গলা পুড়ে গেল। ভালো। এই আমার দরকার। আর-একটু গিলতে-গিলতে নীরদ ভাবল। গলা আগুন। এই আগুন আমার ভিতরের পাপ পুড়িয়ে দেবে। সেই জন্যই তো এখানে আসা।

'আরে দাদা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন কি, দাঁড়িয়ে মদ খাওয়ার মজা নেই।' পায়জামা-পরা লোকটা নীরদকে ডাকে, 'আসুন, এখানে জায়গা আছে।' নীরদ ডাক শোনে, মানুষটার মুখ দেখে, কিন্তু ওঁদিকে সরে যায় না। ভাবে,—'আগুন দিয়ে ভিতরটা পুড়িয়ে সোনা করে আজ বাড়ি ফিরব। আর আমি অসামাজিক হয়ে থাকব না। দশজনের একজন। আর গুলি করে আমাকে মারবার জেলে পুরবার কথা সুধাংশু মুখে আনবে না।'

'মদ খেলে আরো কিছু চাই, হা হা হা।' পিছনে হাসির ধমক তুলে লোকটা সঙ্গীকে বোঝায়। 'বুঝলি নেপ্‌লা, ওই জিনিস পেটে গেলে কি শালা গা মোচড় দিয়ে উঠল, হা হা হা।' 'ও শালা পাপকথা আমার কানে দিস না গোপ্‌লা—মাইরি, আমি হাত জোড় করে বলছি, ও-পথে আমি ক-কৃ-খ-নো নেই।' 'শালা তুই একটা অজবুক, তুই একটা গাধা। হা হা হা—' হাসতে হাসতে সঙ্গীর গায়ে ঢলে পড়ে নেপ্‌লা বলল, 'তবে কি শালা তুই গেরস্থ ঘরের—'

লোকটার কথা শেষ হতে না-হতে নীরদ গ্লাস উপুড় করে সবটুকু শেষ করল। 'একটু আদা দেখি।' নেপ্‌লা-নামক অল্প বয়সের ছেলেটির শালপাতা থেকে নীরদ আদা-নুন তুলে মুখে পুরল, তারপর গোপ্‌লা-নামক সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতার মতন করে বলল, 'হ্যাঁ, পাপ হল গিয়ে সেসব কাজ, বুঝলে ব্রাদার, লাখ কথার এক কথা, আর সেসব পাপী অসামাজিক জীবকে আমার হাতে আইন থাকলে পুলিশ থাকলে স্রেফ গুলি করে মারব, জেলখানায় পুরব,—ইচ্ছা হয় পকেটে কড়ি থাকে চলে যাও, চলে যাও—' বলতে-বলতে টলতে-টলতে নীরদ দোকানের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় নামল।

'এই রিক্‌শা!'

'বাবু!'

'চলো।'

'কিধারমে যায়গা?'

'জাহান্নামে—'

যেন কি বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে রিক্‌শাওয়ালা ছুটে চলল।

'বাবু!'

রিক্‌শা দাঁড়াতে নীরদ চমকে উঠল। এসে গেছে? ধারেকাছে এরা আছে! কলকাতা

শহরে এরা কত জায়গায় আছে নীরদ তার খোঁজ রাখে না। দরকার পড়েনি। কিন্তু এখন থেকে দরকার হবে। মিস ভৌমিক, সমর চ্যাটার্জিদের দলে আর আমি নেই। রিক্‌শাওয়ালার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে একটা গ্যাসের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে নীরদ ভাবে। এই রাস্তার চেহারাটা আরও অদ্ভুত। উলটো দিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান। তাছাড়া আর দোকানপাট নেই। কেবল একটা লোক গুরুগম্ভীর গলায় 'মাংসের ঘুঘ্‌নি' হাঁক ছেড়ে ওধারে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর লোকজন নেই পথে। নীরদের একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আঙুলে আংটি, সোনার বোতাম আর কিছু খুচরো নোট ছাড়া তার সঙ্গে তেমন কিছু মূল্যবান জিনিস নেই। আছে। ঘড়ি। কিন্তু তার-ই বা কত দাম! সে-কথা নয়। অজানা অচেনা পাড়ায় গুণ্ডা-বদমায়েসের হাতে মার খাওয়ার ভয় যেমন আছে খামকা অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করার আশঙ্কাও কিছু কম কি। নীরদ একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে একসময় সে ভুলে যায়। সোঁ করে মোটরগাড়িটা তার নাকের সামনে দিয়ে ঝড়ো হাওয়া তুলে বেরিয়ে যেতে নীরদ চোখ তুলল। 'স্যার,' মুখের সামনে মুখ এনে বাবরি-চুলওয়ালা একটা লোক ফিসফিসিয়ে উঠল, 'স্কুল গার্ল'। বুকের রক্ত উছলে উঠল নীরদের। 'চল, কোথায় দেখি।' 'বাবু এপাড়ায় নতুন এলেন?' লোকটার কথার উত্তর দিল না নীরদ। তাকে পাশে রেখে হাঁটতে লাগল। চোখ তেরছা করে ও যে নীরদের হাতের ঘড়ি এবং বুকের সোনার বোতামগুলো দু-একবার দেখল নীরদ তাও লক্ষ্য করল। কিন্তু মানুষটা এমন ক্ষীণদেহ, হাত ও পা দুটো এত সরু যে একটা ধাক্কা দিলে সাত হাত ছিটকে পড়বে অনুমান করে নীরদ নিশ্চিন্তমনে হাঁটে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দুজন একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে কি-একটা গাছ। তাই জায়গাটা আরো অন্ধকার। ডাল-পাতা দরজার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসার কথা মনে পড়ল নীরদের, সামনেটা গাছে-গাছে এমনি অন্ধকার হয়ে আছে। তবে সেই গাছ আরও উঁচু, বাড়িটাও দোতলা। এত নিচু দালান নয়। লোকটা দেয়ালের গায়ে একটা বেল্‌ টিপতে ভিতরে একটা খুটখুটে আওয়াজ উঠল। যেন চটি পায়ে কে তাড়াতাড়ি দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ায়। দপ্‌ করে চোকাঠের মাথায় একটা বড় আলো জ্বলে উঠল আর পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। একটি রক্ত-করা মুখ। শাড়ির চেয়ে বেগুণী শায়াটাই বেশি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, পায়ে চটি। লাল চটি। বেণীটা বুকের ওপর এসে দুলছে। ছোট্ট বেণী। মাথায় গোলাপী রিবন বাঁধা। অল্প বয়সের মেয়েরা যেমন করে বাঁধে। কিন্তু চোখ, চাউনি? নীরদ ঘাড় ফিরিয়ে বাবরি-চুলওয়ালার দিকে তাকায়। নীরদের হাসিখুশি চোখ দেখে লোকটা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতে সে হাত বাড়িয়ে নীরদকে ধরে ফেলল। 'আসুন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না, ভিতরে আসুন।' মিষ্টি না হলেও গলাটা মসৃণ পরিচ্ছন্ন। চৌকাঠ ডিঙোবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

ছয়

অনুশোচনা, দুঃখ, রাগ কিছুই হল না নীরদের। বরং রিকশা করে বাড়ি ফেরার পথে নিজের মনে সে হাসল। নেশার চাপটা কমেছে। মাথাটা হালকা লাগছে। হাওয়াটা মিষ্টি। গদির ওপর হেলান দিয়ে বসল সে। সুধাংশুর গাড়ি থেকে কেটে পড়ার পর সবগুলো ঘটনা বিক্ষিপ্ত ছবির মতো তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। যেন এখনি সবগুলো ছবি

ঝাপসা-ঝাপসা হয়ে আসছে। সেই নেপ্‌লা গোপ্‌লা। কাউণ্টারের মোটা ভুঁড়ির লোকটা। তাদের হাসি, তাদের কথা, মুখের বিকৃতি। মুখের কাছে মুখ এনে বাবরি-চুলওয়ালা ক্ষীণকায় মানুষটির ফিসফিসানি। আর? এখনি অস্পষ্ট হয়ে গেছে—মুছে যাচ্ছে রং-করা মুখ। ডলি। 'নামটা বেশ, ডল হলে আরো ভালো লাগত শুনতে, ডাকতে।' নীরদ হেসে বলেছিল।

কিন্তু সে তো গেল।

ঘড়ি-ধরা সময়ের আনন্দ বিলিয়ে, আনন্দ নিয়ে এখন যে সে ঘরে ফিরছে তা কদিনের পুঁজি! না কি কাল আবার যাবে! ভাবতে নীরদের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয় সে অবশ্য খুব বেশি করে না। আনন্দের জের মেটাতে কিছু ইঞ্জেকশন নিতে হয় নেবে। সুধাংশুকে দিয়েই নেবে। শুনে বন্ধু হাসবে। নাকটা একটু কুঁচকাবে কি! তাহলেও অল্প সময়ের জন্য। নীরদ তা গ্রাহ্য করবে না।

'কিন্তু তা তো বুঝলাম।' নীরদ নিজেকে বলল, 'এই তৃপ্তি কদিনের, কতটুকুন এর আয়ু।' ভাবল, 'যেন শিশুকে চাঁদ ধরতে দেওয়ার ছল করে একটা শ্বেতপাথরের থালা তার সামনে বাড়িয়ে দেওয়া, পর্বতের নাম করে উঁই-ঢিপি দেখানো।' নীরদের শরীর মন তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল : 'না না, তা হয় না, যদি হত তবে কি আর—' গাছের অন্ধকারে রিকশা দাঁড়াতে তড়াক করে সে লাফিয়ে নিচে নামল। সবটা বাড়ি ঘুমোচ্ছে। এই ফ্ল্যাট ওই ফ্ল্যাট। কিন্তু রাত খুব বেশি হয়েছে কি? নীরদ আবার হাতের ঘড়ি দেখল। দশটা পাঁচ। অন্যদিনের চেয়ে তো বেশিই রাত করে ফেলল সে। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে অস্থির দ্রুত পায়ে সে মরা গাছের টব-বসানো সরু গলি পার হয়ে ঘোরানো সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়াল। একবার ওপরের দিকে তাকাল। অন্ধকার করিডোর ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে কী? খুব নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। যেন এইজন্যই নিশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করে রাখল একটু সময়। পাশের পড়ো ঘরের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট চিঁ-চিঁ শব্দ ভেসে আসতে শুনল নীরদ। ইঁদুর। একবার ভাবল পায়ের জুতো খুলে হাতে নিয়ে সে ওপরে উঠবে কিনা। কিন্তু বাস্তবিক যদি ও করিডোরের কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে লুকিয়ে অপেক্ষা করে জুতো হাতে করে উঠছে দেখলে হাসবে। 'এত ভয়! এত ভয় করার কি আছে বলুন, সব ভয় লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে না আমরা এতদূর এগিয়ে এলাম! আর একটু সাহস করুন, পুরুষ আপনি, আপনি যদি ভয় করেন আমার কি হবে বলুন।' নীরদ ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের গলার ঘাম মুছল। তারপর আর ইতস্তত না করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। কিন্তু তা-ও চোরের মতন, জুতোর শব্দ না হয় এভাবে পা টিপে-টিপে সে ওপরে উঠল। সিঁড়ি শেষ করে চোখ বড় করে সে অন্ধকার প্যাসেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দৃষ্টিচালনা করে নিশ্চিন্ত হল। কেউ নেই, কিছু নেই, অস্পষ্ট ধূসর সাদাটে কি কালোমতন কোনো-কিছুর আকৃতি কোথাও অপেক্ষা করছে বলে মনে হল না। এবার নীরদ হতাশ হল। ফাঁকা অন্ধকার প্যাসেজটার মতন তার বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠল। কেমন যেন তার রাগ হল। শূন্যতো তেতো-মতন একটা ঢোক গিলে এক-পা এক-পা করে নিজের ঘরের দিকে চলল। কটমট চোখে ডান-দিকের ফ্ল্যাটের একটা বন্ধ দরজার ওপর দুবার দ্রুত চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে খানিকটা গরম নিশ্বাস ফেলে কি যেন বিড়বিড় করে উঠল।

'বাবা, তুমি এসেছো?'

'হ্যাঁ বাবা, হরির মা কোথায়?'

'মাসি ঘুমোচ্ছে।'

হাত বাড়িয়ে নীরদ সুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। মেঝের একপাশে হরির মা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। চোখে আলোর বাড়ি লাগতে যেন ধড়মড় করে উঠে বসল। হাই তুলল একটা।

'রাত হল আজ, দাদাবাবু?'

'হ্যাঁ, একটা কাজে এক জায়গায় যেতে হয়েছিল।' নীরদ কাপড় ছাড়তে লাগল। বাবু ফ্যালফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। হরির মা উঠে দাঁড়ায়।

'উঁ, কেমন যেন একটা ওষুধের গন্ধ পাচ্ছি, দাদাবাবু।'

নীরদ চমকে উঠল। তার মুখের গন্ধ। এত তীব্র গন্ধ নিয়ে সে আর ঘরে ঢোকেনি কোনোদিন। বিব্রত হয়ে চট্ করে ঘুরে দাঁড়ায়। টেবিলটা দেখে। 'কোনো ওষুধের শিশি-টিশি পড়ে গেল কি। যা ইঁদুর সারা বাড়িতে।'

'তাই হবে গো, দাদাবাবু।' বুড়ী আর একটা হাই তুলে টেবিলের দিকে এগোয়।

'থাক, থাক। কাল সকালে দেখা যাবে। এই বেলা তুমি কেটে পড় তো হরির মা,—দাঁড়াও, আমি আলো দিচ্ছি।' নীরদ চট্ করে টেবিলের টানা খুলে ছোট টর্চলাইটটা বার করে হরির মার হাতে দেয়। বুড়োমানুষ, রাত্রে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার অসুবিধা দেখে নীরদ ওর জন্য একটা ক্ষুদে টর্চলাইট রেখেছে। বুড়ী ওটা রাত্রে সঙ্গে নিয়ে যায়। সকালে আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

'হাতমুখ ধোয়ার জল রেখেছি ও-ঘরে। ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছি। এ-ঘরে এনে রাখব?'

'কিছু করতে হবে না তোমাকে—সারাদিন তো করছ—এখন যাও তো—বাড়িতে চিন্তা করছে ওরা হয়তো।'

'বাবু! সোনা আমার, যাই—? কাল সক্কালে চলে আসব,—কাক ডাকার সাথে সাথে আমি এসে যাব। তুমি ঘুমোও মণি। বাবা এসে গেল আর চিন্তা কি! যাই?'

বাবু কথা না বলে মাথা নাড়ল।

'দুর্গা! দুর্গা!' বলতে-বলতে বুড়ী বেরিয়ে গেল। বুড়ী বেরিয়ে যেতে নীরদ স্বস্তিবোধ করল। গায়ের গেঞ্জিটাও খুলে ফেলল। 'খোকা এখনো ঘুমোসনি কেন রে?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা! তোমার পায়ের শব্দে তো জেগে উঠলাম।'

'ঘুমোও, ওষুধ-টষুধগুলি সব খেয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

নীরদ আর কথা বলল না। তোয়ালে সাবান নিয়ে পাশের ঘরে চলল। একটা নর্দমা থাকায় ও-ঘরে হাতমুখ ধোবার অসুবিধা নেই। কিন্তু তাহলেও একবার চিন্তা করল সে বালতি মগ ওখান থেকে তুলে এনে প্যাসেজের কলতলায় চলে যাবে কিনা। ঘরে ফিরে রাত্রে নীরদ কলতলায় হাতমুখ ধোয়। মাঝে-মাঝে স্নান করে। কেননা, তখন নটার জল এসে যায়। আজ রাত বেশি হয়ে গেল বলে হরির মা জল তুলে ঘরে এনে রেখেছে। চিন্তা করল বটে, কিন্তু কি ভেবে সে আর কলতলায় গেল না। কলতলার চেহারাটা এবং পাশের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা দুটোর ছবি মনে-মনে আঁকতে আঁকতে সে হাতমুখ ধোয়ার কাজ শেষ

করে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে চলে এল।

'বাবা!'

'আঃ তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?' নীরদ মুখ মুছতে মুছতে ছেলের দিকে তাকাল। বাবাকে বিরক্ত হতে দেখে বাবু লজ্জা পেয়েছে বোঝা যায়। চুপ করে রইল।

'কি, বলো!' নীরদ গলাটা নরম করল।

'না, বলছিলাম কি তুমি এখন খেয়ে ফেলো। এমনি তো ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আছে।'

'থাক, তা নিয়ে তুমি ভাবছ কেন। অতটা সময় জেগে থাকলে কাল আবার শরীর খারাপ করবে। তুমি ঘুমোও তো এখন।'

বাবু এবার অল্প হাসল।

'আজ একবারও গা গরম হয়নি, বাবা।'

'সেরে যাবে। বলছি তো তুমি আস্তে-আস্তে সেরে উঠছ।' নীরদ বিছানার কাছে সরে গিয়ে ছেলের কপালের ওপর হাত রাখল। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঘামটা তো আজ আর তেমন আঠা-আঠা ঠেকছে না। তার মানে শরীরটা ভালো আছে।'

'অফিসে ছুটির কথা বলেছিলে বাবা?'

সারাদিনের যন্ত্রণাটা আবার এখন নীরদের বুকের ভিতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিমর্ষ হয়ে গেল চেহারা। আমতা-আমতা করে সে বলল, 'দেখছি, আজ বড়সাহেব ভয়ঙ্কর ব্যস্ত ছিল। হ্যাঁ, ছুটি তো আমাকে নিতেই হবে। মাস দু-তিন অন্তত। তিনমাস না-ও দিতে পারে। তবু বলব, ছেলেকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে হচ্ছে।'

বাবু খুব বেশি উৎফুল্ল হল না কেন নীরদ বুঝল। কেননা, তার নিজের কানেই নিজের গলার স্বরটা নিস্তেজ অপ্রসন্ন ঠেকছিল। ছেলের কপালের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে আনল। ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালে প্রতিমার মুখটা দেখল। কিন্তু এক সেকেণ্ডের বেশি না। ফটো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়ায়।

'তুমি খেয়ে নাও বাবা। ছুটির কথা এখন ভেবে কি হবে।'

নীরদ ছেলের চোখের দিকেও তাকাতে পারল না। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মুখে বলল, 'তুমি এবার ঘুমোও খোকা।' বলে সে আস্তে-আস্তে পাশের কামরার দিকে চলল।

কামরাটা অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু তা হলেও রান্না খাওয়া ভাড়ার হিসাবে নীরদের কুলিয়ে যায়। প্রতিমা থাকতেই কুলিয়েছে; এখন তো সংসার আরো ছোট হয়ে গেছে। একটা ছোট টিপয়ের ওপর তার রাত্রের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখে হরির মা। কাচের গ্লাসে জল। গ্লাসটার মুখে একটা-কিছু ঢাকনা থাকে! আজ সেটা নেই। হরির মা ভুলে গেছে, না ঢাকনাটা ইঁদুরে-টিঁদুরে ফেলে দিল নীরদ চিন্তা করতে-করতে লোহার চেয়ারটা টিপয়ের কাছে টেনে নিল। চেয়ারটা সিমেণ্টের ওপর ঘষা খেয়ে কড়াৎ করে একটা শব্দ তুলল। শব্দটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে নীরদ কান খাড়া করে ধরল। আর কোনো শব্দ না হয়—এভাবে আস্তে, প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে সে চেয়ারে বসল। বেশ কিছুটা সময় কাটল। না, পৃথিবী মরে আছে। আজ আর কোনো শব্দ হবে না এবাড়ির কোথাও। সব ঘুমে বেহুঁশ। কেবল আমি জেগে আছি আর আমার রুগ্ন সহিষ্ণু শান্ত ছেলে। জেগে থেকেও যে শব্দ করতে চায় না। এখন হয়তো সেই জাগ্যটুকুও ঘুমে আচ্ছন্ন নির্জীব হয়ে এল। নীরদের একবার ইচ্ছা হল পা টিপে-টিপে ও-ঘরে গিয়ে দেখে খোকা ঘুমিয়ে পড়ল কিনা।

যেন খোকা ঘুমিয়ে পড়লে আমি স্বস্তিবোধ করব। তাই কি? কোনো শব্দ না হয় এভাবে থালার ঢাকনাটা তুলে একদিকে সরিয়ে রেখে নীরদ ভাত ভাঙতে লাগল। খোকা ঘুমিয়েছে ধরে নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর? ভাতের গ্রাসের সঙ্গে মাছভাজা ভেঙে মুখে তুলে নীরদ কড়িকাঠের দিকে তাকায়। ঘুমন্ত খোকার মুখের পাশে আর-একটা মুখ। আগে এটা হত না। এখন ঘন-ঘন নীরদ ছেলের মুখের পাশে আর-একটা মুখকে দেখছে। যেন দুটিতে যুক্তি করে নীরদের সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। আশ্চর্য, এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক! সম্পর্ক নেই, থাকার কথা নয়, সম্পর্ক সৃষ্টি করছ, তুমি, তুমি নীরদ। ভাতটা গলার কাছে তেতো-তেতো ঠেকে। নীরদ কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে গ্লাস তুলে জল খায়। যেন আমার এই অস্তিত্বের রূপ বদলে ফেলতে পারলে আমাকে ঘিরে আমার চোখের সামনে দুটি মুখের ছবি একসঙ্গে ভেসে ওঠা বন্ধ হবে। তাই কি চেয়েছিল আজ নীরদ? সারাদিন অফিসে বসে এই চিন্তা করেছিল? সুধাংশুকে বলতে সাহস পেল না বলে নিজের রূপ বদলাতে কিছু খাদটাদ মিশিয়ে ঢালাই-পেটাই হয়ে অন্য মানুষ, সম্পূর্ণ অন্য এক নীরদ হয়ে ঘরে ফিরতে চেষ্টা করেও কিছু কাজ হল না। নিরুপায় ব্যর্থ নীরদ আবার একটা ভাতের গ্রাস গিলতে চেষ্টা করল, তারপর যেন ভয়ে-ভয়ে, ওপরে কড়িকাঠের দিকে চোখ মেলে ধরল। ঠিক আছে দুটিতে। মলিন বিষণ্ণ চোখ মেলে খোকা হাসছে। কামনা বাসনা লোভ লাস্যের আগুন দু-চোখে জেবলে রেখে খোকার পাশে ও হাসছে। চুপ করো, হাসি থামাও, আমার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াও, সম্পূর্ণ পিছন ফিরে থাকো—কাকে বলবে? কাকে বলতে চাইছে নীরদ? কোন মুখকে? গলায় ভাত আটকে গেল নীরদের, কপালটা আবার ঘামছে। আবার সে জলের গ্লাস তুলতে কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে আনল। খাওয়া হল না। ডিসপেপটিক রুগীর মতন পেটের ভিতরটা কেমন যেন ফুলে আছে, গুরগুর করছে। আর একটা ভাত মুখে তুললে বমি হবে। সত্যি তো তার বমি হবে! দেশী বিলাতী দু-জাতের এতটা পেটে গেলে বমি না হয়ে যায়! চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে নীরদ তাড়াতাড়ি নর্দমার মুখের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিতে হড়হড় করে টক দুর্গন্ধ নরম শক্ত কত কি সব বেরিয়ে এল। একবার দুবার। মাথাটা পাতলা হয়, পেটের ভারটা কমে। বেশ হালকা বোধ করে সে। ভালো লাগছিল তার এখন। মুখটা ধুয়ে ফেলল। বালতি উপুড় করে সবটা জল নর্দমায় ঢেলে দিয়ে বমিটা সরিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে এল। তারপর আলো নিভিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নীরদ শোবার ঘরে এসে ঢুকল। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। 'খোকা ঘুমিয়েছিস?' অত্যন্ত আস্তে ডাকল নীরদ। সাড়া নেই। খোকা ঘুমিয়ে পড়ল আর শরীরটাও হালকা লাগছে, যেন দুটো একসঙ্গে ঘটল বলে নীরদ হঠাৎ খুব নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত এবং স্বাধীন! একটা হালকা স্ফূর্তির আমেজ মাথায় নিয়ে সে টেবিলের টানা খুলে নতুন সিগারেটের প্যাকেট বার করল। বার করে কি করতে যাবে,—এমন সময়। মাত্র একবার শব্দটা হয়। অন্ধকার প্যাসেজের শক্ত বোবা সিমেণ্ট এইটুকুন একটা চামচের আঘাতে আর্তনাদ করে উঠে আবার চুপ। অত্যন্ত পরিচিত নীরদ এই করুণ আকুতির সঙ্গে। নিশির মধ্যপ্রহরের কামনা লোভ লাস্য একটা চামচ চাবি কি টিনের কৌটোর মুখ ছিটকে পড়ার ঝনঝন শব্দ হয়ে নীরদের বুকে এসে ধাক্কা দেয়, মগজে বাড়ি মারে। আর অভ্যস্ত চঞ্চল পায়ে নীরদ ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে প্যাসেজের অন্ধকারে ছুটে যায়। খেতে বসে আমি কি এই শব্দ শুনতে বার বার কান খাড়া করে ধরেছি? কান খাড়া করে ভেবেছি পৃথিবীর আর কোনো আকুতি আজ আমাকে ঘরের বাইরে টেনে নিতে

পারে না? আমি অন্য মানুষ আমি অন্যরকম? চিন্তা করল নীরদ। চিন্তা করে মনে হল এতক্ষণ সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল, প্রলাপ বকছিল নিজের সঙ্গে। এখন সে তার পরিচিত অভ্যস্ত স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে পেয়েছে। মনে হওয়ামাত্র আর এক সেকেণ্ড দ্বিধা না করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে ছুটে গেল।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

'না।'

'কাঁদছিলে মনে হয়!'

'বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

নীরদ চুপ করে রইল একটু সময়।

'মুখ থেকে এত খারাপ গন্ধ বেরোচ্ছে কেন?'

নীরদ একটা ঢোক গিলল তারপর প্রবল আকর্ষণে মালার মুখটা আবার বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলে কপালে নাকে চিবুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। মালা কাঁপছে। নীরদের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। যেন একটা-কিছুর ভর না পেলে দুজন পড়ে যাবে, তাই কলঘরের সামনের ছোট দেয়ালটা অবলম্বন করে দুজন দাঁড়ায়। মালা ঘামছে। নীরদের গেঞ্জি ভিজে গেছে, মালার ব্লাউজ ঘামে ভেজা। বুকের দিকটা পিঠের দিকটা।

'কথা বলছেন না কেন?' মালা ঢোক গিলছে—শব্দটা নীরদের কানে লাগল।

'কি কথা?' ওর বুকের ওপর থেকে মুখ তুলে নীরদ চোখ দুটো দেখল। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে। স্ফুরিত নাসারন্ধ্র মালার। থুতনি তুলে নীরদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কি কথা আপনি কি জানেন না!'

গরম ঠোঁট দুটো আবার ওর থুতনির ওপর চেপে ধরল নীরদ। এবার একটু জোর করে থুতনিটা ছাড়িয়ে নিল মালা।

'কথা বলুন। এখানি কেউ জেগে উঠে বাইরে আসতে পারে।'

'আমি চিন্তা করছি, আমি তো বললাম, চিন্তা করে দেখছি।' খসখসে গলায় নীরদ উত্তর দেয়।

'এখনও চিন্তা!' চাপা নিশ্বাস ফেলল মালা। 'আর চিন্তা করার সময় নেই।' একটু থেমে পরে বলল, 'তুমি কি জান না কত কষ্টে এখানে আমার দিন কাটছে! দিন কাটছে না।'

এই প্রথম নীরদ 'তুমি' সম্বোধন শুনল। তার হাত দুটো হঠাৎ কেমন শিথিল হয়ে আসছিল। দু পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। যেন পড়ে যাবে। যেন পড়ে না যায় এভাবে শক্ত করে মালাকে ধরে রইল।

'কী হল?' মালা এবার আর নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল না। নীরদের বুকের সঙ্গে মিশে রইল। 'কথা কও।' অস্ফুট আর্তনাদের মতো গলার স্বর। 'কথা কও।'

'আজ আমি খুব বেশি মদ খেয়েছি।' নীরদ মৃদু হাসল। 'তাই মুখে এত গন্ধ পাচ্ছ।'

'কেন!'

'তোমাকে ভুলতে,—তোমার—'

কথা শেষ করতে দিল না মালা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

'এই শোন!'

সরে দাঁড়িয়েছিল মালা। নীরদ হাত বাড়িয়ে ডাকল।

'শোন, ঠাট্টা করছিলাম।'

মালা আবার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।

'আমাকে ভুলতে চাইলেও আমি ভুলতে দেব না, তুমি জানো?' ফিসফিস করে বলল বটে ও কিন্তু নীরদের মনে হল তার দু-কানে যেন একটা ঝড় ফুঁসিয়ে উঠল। 'আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার শরীর মনের সব বোধ রেণু-রেণু করে গুঁড়িয়ে দিয়ে ভাইয়ের সংসারে দাসীগিরি করছিলাম। আজ—আজ তুমি—'

'ছিঃ, কাঁদে না।' নীরদ হাত দিয়ে ওর চোখের জল মোছে। 'আমি সত্যিই ঠাট্টা করছিলাম।'

'না, আজ দুদিন ধরে লক্ষ্য করছি তুমি যেন একটু অন্যমনস্ক। যেন আমাকে এড়াতে চাও। তখন অফিসে বেরোচ্ছ, আমি একটা বাটি ধোবার ছল করে তাড়াতাড়ি কলতলায় ছুটে এলাম। একটু কেশে শব্দ করলাম পর্যন্ত; তুমি তাকাও নি, তুমি ঘাড় ফেরাও নি।'

'ভাবলাম তোমার বৌদিও বুঝি কলতলায় আছে।'

'না, ছিল না।' চাপা কণ্ঠস্বর আবার ঝড়ের মতো ফুঁসিয়ে উঠল। 'আপনি সত্যি করে বলুন মনে-মনে কি ঠিক করেছেন।' এবার 'আপনি' সম্বোধনটা গরম শলার মতো নীরদের কানে ফুটল আর সঙ্গে-সঙ্গে সে ভয় পেল। যেন ও তাকে ঠিক চিনে ফেলেছে। আর লুকিয়ে চলার উপায় নেই। তথাপি নীরদ মৃদু গলায় হাসল। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। খোকার জন্য মনটা মাঝে-মাঝে খারাপ থাকে—তাতেই যদি তুমি—'

'আমি তো সে-কথা বলি না।' প্রবল বেগে মালা মাথা নাড়ল। খোঁপা অনেকক্ষণ আগেই ভেঙে গেছে, এবার ঝাঁকুনি খেয়ে চুলের রাশ অন্ধকার বন্যার মতো ফুলে উঠল, ফোঁপে উঠল। 'খোকাকে আপনার চেয়ে আমি কম ভালোবাসি না। আমিও সারাক্ষণ ওর কথা ভাবি। দুপুরে ফাঁক পেলে লুকিয়ে ওর কাছে যাই। ও আমায় ভালোবাসে। খোকাকে নিয়ে আমি বেশ থাকতে পারব।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীরদ। এতদূর,—মনে-মনে এতটা অগ্রসর হয়ে আছে এই মেয়ে! ভেবে নীরদের মুখে কথা সরল না কিন্তু তার বিস্মিত বিব্রত হওয়ার এইখানেই শেষ নয়,—যেন আর একটু বাকি আছে। মালার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। যেন চরম কথা শোনাতে সে নীরদের শিথিল হাতের আকর্ষণ থেকে আর-একবার নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাত দিয়ে এলোচুল ঠিক করতে-করতে বলল : 'আগুন জ্বালিয়ে এখন আমি ভুলতে চাইছি। বেশ, যদি তাই তোমার মনের ইচ্ছা, দেখবে আমি কি করি।'

'কী করবে?' নীরদ এক-পা এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ওকে। মালা ধরা দিল না। দু-পা পিছিয়ে গেল।

'কী করবে?' আর-একবার প্রশ্ন করতে চেষ্টা করল নীরদ। কিন্তু তার আগেই অন্ধকারের বুক চিরে ঝড়ের ফুঁসানি তার কানের পর্দার ওপর এসে আছড়ে পড়ল।

'গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আমি সব জ্বালা জুড়াব।'

'এই শোন, কি-সব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ!' নীরদ ফিসফিসিয়ে বলল বটে, কিন্তু মালা তার আগেই ভিতরে ঢুকে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছে। ছিটকিনি তোলার শব্দটা টুক্ করে এসে তার কানে লাগল। যেন দু-পায়ের ওপর দাঁড়াবার শেষ শক্তিটুকু নীরদের চলে গেল। কোনোরকমে দেয়াল ধরে-ধরে সে নিজের ঘরে চলে এল।

সাত

প্রথমে নীরদের মনে হল মেয়েটা যে খুবই অশিক্ষিত এটা তার প্রমাণ। অমার্জিত এবং অশিক্ষিতেরা এখনও এই যুগে একরোখা থেকে গেছে। তাদের বৈশিষ্ট্য সামান্য একটু-কিছুতেও তারা ভয়ঙ্কর সিরিয়স হয়ে উঠতে পারে। জীবন যাক আর থাক। অথবা কথায় কথায় জীবন দেওয়া কথায় কথায় অপরের জীবন নেওয়া।

অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে-টানতে নীরদ চিন্তা করছিল। যেন জীবনটা কিছুই নয় এদের কাছে। আমি সুইসাইড করব। আমি তোমাকে খুন করব। নীরদ একবার নিজের মনে হাসল। তার এখন রাণু ভৌমিকের মুখটা মনে পড়ল। মেলামেশা ভোগ-সম্ভোগ তার জীবনে যথেষ্ট হয়েছে। রাণু ভৌমিকের জীবনে অনেক আশার আলো জ্বলেছে, তারপর আবার এক-একটা দমকা হাওয়া এসে সেগুলোকে নিভিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা কি কোনোদিন কল্পনা করা যায় যে রাণু ভৌমিক হতাশ হয়ে বঞ্চিত হয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে শেষ করবে? না কি মাথা খারাপ করে চ্যাটার্জির জীবন নষ্ট করতে তার পিছু-পিছু ধাওয়া করবে? আর আজ, এখন, অন্ধকার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটার মুখে সে কী শুনল? 'এমন কথা ওর মুখ থেকে বেরোবে আমি কোনোদিন কল্পনা করি নি। আমি তো ভেবেছি—'

কী ভেবেছিল নীরদ? হাতে সিগারেট জ্বলছে। কিন্তু তা টানতে ভুলে গিয়ে চোখ বুজে সে তিন মাস আগের প্রথমদিনের ঘটনা থেকে সব এক-এক করে মনে করতে চেষ্টা করল। খুব স্বাভাবিক, পাশাপাশি ফ্ল্যাট, দুপুরবেলা সে ঘরে থাকে না, হরির মা আর নীরদের রোগা ছেলে আছে, এ-অবস্থায় ওর দাদা-বৌদি বাড়ি নেই, দাদার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এঘরে এসে বসবে, ওদের সঙ্গে কথা বলবে। বেশ কিছুকাল ধরেই এরকম চলছিল। নীরদ পরে চিন্তা করে দেখেছে। সেদিন হঠাৎ শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে আধখানা অফিস করে সে ঘরে ফিরে বাবুর শিয়রের কাছে খাটের ওপর একটি মেয়েকে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে দেখে নীরদ খুব বিস্মিত হয় নি, এবং পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে সে দেখেই চিনল। সেদিন ভালো করে দেখল মেয়েটির বয়স খুব বেশি না। মুখখানা মিষ্টি। কেমন যেন একটা সারল্যের ভাব রয়েছে। একটা সাধারণ আটপৌরে সবুজ শাড়ি-পরা। ছিটের একটা ব্লাউজ যেন গায়ে ছিল নীরদের মনে পড়ে। তবে নীরদক সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল ওর গায়ের রং। ঘরে ঢুকেই নীরদের প্রথম যা মনে হয়েছিল এত ভালো রং সে অনেকদিন দেখে না, হয়তো কোনোদিনই দেখে নি। তাই দুবার সে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখছিল। কিন্তু এটাও সত্য, এবং আজকের এই পরিণতির জন্য হয়তো ওই মেয়েও কিছুটা দায়ী, কেন না, যতবার নীরদ সেদিন ঘাড় ফিরিয়েছে একজোড়া চোখ স্থিরভাবে মেলে ধরে মেয়েটি তাকে দেখছিল। লক্ষ্য করে নীরদ কিছুটা অবাক হয়েছিল। তারপর সে চিন্তা করেছে, অতিরিক্ত সরল বলেই একজন পুরুষকে কাপড় ছাড়তে দেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে যে অশালীনতা কিছু থাকতে পারে তা ওর মাথায় ছিল না। তারপরও মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘরে ছিল। চেয়ারে বসে নীরদ কাগজ পড়ছিল। বেদানা

ভেঙে একটা-দুটো দানা বাবুর মুখে ভেঙে দিতে-দিতে হরির মার সঙ্গে মেয়েটি কলের জল, ঘুঁটের দাম, গরম পড়েছে, বৃষ্টি নেই, মাছ না মিললে রোজ হাঁসের ডিম কত খাওয়া যায় ধরনের কথা বলতে শুনছে। তারপর একসময় বাচ্চাটা খুব কাঁদাকাটা আরম্ভ করতে বিব্রত হয়ে মেয়েটি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘরে মেয়েছেলে না থাকলে প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীদের সম্পর্কে কোনো পুরুষই বিশেষ কিছু সংবাদ পায় না। পায় না এবং পাওয়ার ইচ্ছাও বড়-একটা রাখে না। নীরদের তাই হয়েছিল। তাছাড়া এরা নতুন ভাড়াটে। এদের আগে পাশের ফ্ল্যাটে যারা ছিল তাদের সম্পর্কে নীরদ অনেক-কিছু কেন, প্রায় সবকিছু সংবাদই পেত প্রতিমার কল্যাণে। ভদ্রলোকের সঙ্গে শুধু পরিচয় নয় একটা মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল নীরদের। তারপর চাকরির ব্যাপারে হঠাৎ রমেন নাগ অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়াতে সে-ঘর ছেড়ে দেয়। তারপর মাস-দুই ফ্ল্যাটটা খালি থাকার পর কবে জানি একদিন নতুন ভাড়াটে আসে। এরা কারা, পুরুষটি কে, কোথায় চাকরি করে, এর আগে কলকাতায় অন্য পাড়ায় ছিল না কি মফঃস্বলের লোক, এক ভদ্রমহিলা ছাতা-ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বেলা দশটায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তিনি কি বাড়ির গৃহিণী, কি কাজ করেন, একটি মেয়ে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি নেই বোঝা যায় না, কে ও, মহিলাটির কে হয়? বোন? ননদ? বোনের মেয়ে? ভাগ্নী? নীরদ কিছুই জানত না। প্রতিমা বেঁচে থাকলে রমেন নাগের স্ত্রীর মতো হয়তো প্রথমদিনই এই ফ্ল্যাটে বেড়াতে আসত ওই ফ্ল্যাটের কোনো-না-কোনো মেয়ে। পরিচয় হত। সেই সূত্রে দুই ফ্ল্যাটের পুরুষদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব। কিন্তু প্রতিমার অনুপস্থিতিতে সেসব আর হয় নি। কাজেই প্যাসেজ ধরে যেতে-আসতে, কি কলতলায় যদি কেউ এসেছে নীরদ ভাসাভাসা ওপর-ওপর এক-একটি মুখ দেখেছে। যেমন রাস্তায় কি ট্রামেবাসে চলতে সে পুরুষের মুখ দেখে, মেয়ের মুখ দেখে। পরিচয় হয় না, কথা হয় না, অন্তরঙ্গতার প্রশ্ন ওঠে না।

সেদিন মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর হরির মা পরিচয় দিল। দাদার সংসারে আছে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। লোকটা মাতাল চরিত্রিরহীন। দেড় বছর হয় নি বিয়ে হয়েছে। ওকে মারধর করে। এখানে দাদার কাছে চলে এল। সুখে নেই। দাদা লোক ভালো। বৌবাজারে চায়ের দোকান। তেমন আয় নেই ব্যবসায়ে। ভাই-বৌ বি এ পাশ। এখন ইস্কুলে চাকরি করে। না করে করবে কি। আর তাই না সব রাগ ঝাড়ছে এখন মেয়েটার ওপর। 'হুঁ, ননদের ওপর। বাড়তি মুখ সংসারের। খরচ ডবল বেড়ে গেল। কথায়-কথায় মুখ-ঝামটা। অথচ সারাটা দিন, আমি তো চোখের ওপর দেখি, মুখ বুজে মেয়েটি হাঁড়ি ঠেলছে, কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন ধুচ্ছে, ঘর মুছছে, জল টানছে, তার ওপর একটা বাচ্চা। আমি তো দেখেছি গেল-কার্তিকে যখন এ-বাড়ি এসে উঠল মালা, দুগ্গাঠাকুরের মতো গায়ের রং ছিল, কেমন জবরদস্ত শরীর ছিল। এখন তো সেই রঙের কিছু নেই, খেটে-খেটে দেহ আধখানা করে ফেলেছে।'

একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল নীরদের কাছে। বাচ্চাটা ওর না, দাদার? স্বামী-পরিত্যক্তা। তাই কি? না স্বামীপরিত্যাগকারিণী? পরে অবশ্য নীরদ মালার নিজের মুখে সবই শুনেছে, এখনও শুনছে।

হ্যাঁ, সেই প্রথমদিন খুব কাছে থেকে দেখার পর এবং হরির মার মুখে সব শুনে নীরদ মেয়েটিকে আর ভুলতে পারে নি। কলতলায় প্যাসেজে কি ওদের দরজায় মালা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে নীরদ তৎক্ষণাৎ ওর দিকে বেশ একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়েছে। এটা নীরদের

নিজের দিকের কথা। আর ও? মালা নিজে? নীরদের জুতোর শব্দ গলার শব্দ শুনতে পেয়েছে তো চট্ করে ও কাজে-অকাজে কলতলায় ছুটে এসেছে, দরজায় এসেছে, ঘোরানো সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর? তারপর নীরদ আর চোখ বুজে থেকে চিন্তা করতে পারল না। একটা অদৃশ্য শক্তি তার চোখের পাতা দুটো টেনে খুলে ফেলল। অন্ধকার ঘর। অদৃশ্য শক্তি সেখানেই থামল না। জোর করে তার থুতনিটা ওপরের দিকে ঠেলে তুলে দিল। সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার কড়িকাঠ দেখল নীরদ? না। বড় একটা আয়না। আয়নার ভিতর আর-এক নীরদ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে চেয়ারে-বসা নীরদকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে। প্রশ্ন করছে : 'তারপর? তারপর কি হয়েছে তুমি বল?'

কেমন ভয় পেয়ে নীরদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হল তাকে কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে আনতে। কিন্তু নিচেও সেই আয়না। সেই নীরদ। আঙুল তুলে আছে। কটমট করে তাকাচ্ছে। প্রশ্ন করছে : 'তারপর?' নীরদ ঘেমে উঠল। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সেই হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পাখাটা চালিয়ে দেবে কিনা চিন্তা করল। কিন্তু রাত্রে পাখার হাওয়া বাবুর সহ্য হবে না, ঠাণ্ডা লাগবে চিন্তা করে পাখার কথা ভুলতে হল। 'তারপর? প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন, তার—'

নীরদ বিড়বিড় করে কি বলতে আয়নার নীরদ হেসে উঠল। 'বুঝলাম ও খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ছলছলো করে তোমাকে দেখতে এসেছে; তুমিও চোখ বুজে থাক নি, বরং তোমার রক্ত একটু বেশি চঞ্চল হয়ে উঠত—কিন্তু, কিন্তু—'

নীরদ চোখ বুজল।

'কথা বল? উত্তর দাও!'

নীরদ চোখ খুলল। এবার আয়নায় নীরদ নেই। কটমট করে আর একজন তাকিয়ে আছে। আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে নীরদের দিকে। 'আমি, আমাকে ফাঁকি দিতে পারছ না তুমি, আমি সব দেখেছি, আমার চোখের সামনে এ-ঘরে তুমি ওর কাছে প্রেম নিবেদন করেছ—সব বুঝি, স্বীকার করি, প্রমত্ত যৌবন তোমার সামনে ঘুরে-ঘুরে আসছে, তুমি লোভ সামলাতে পার নি। কিন্তু এখন—'

পড়ে যেত নীরদ। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে ধরে রইল। প্রতিমা তখনও কথা বলছে, রুক্ষ নির্দয় শাণিত কণ্ঠস্বর। চোখ বুজে থেকে নীরদ করবে কি! প্রত্যেকটা কথা তার বুকে এসে বিঁধছে। 'ঠিক বলেছ মালা, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সরে আসার কোনো অধিকার নেই তোমার। বাবু? আমার ছেলে? তোমার রক্ত অথর্ব সন্তান? তার কথা ভেবে আজ তোমার বিবেক জাগল? কী বললে? দুদিনের খেলা? তা হয় না, তা হয় না। তোমার অফিসের রাণু ভৌমিকরা বিষদাঁত উপড়ে ফেলে তারপর প্রেমের খেলায় মেতেছে। স্কি-স্কুল স্কীটের ডলিদের বিষদাঁত নেই, গজায় নি। জাত আলাদা। কিন্তু এ ছাড়াও সংসারে নারী আছে, ক্ষুধা আছে, আগুন আছে, প্রতিশোধ আছে। সেই প্রতিশোধ পৃথিবীতে কত প্রলয় সৃষ্টি করে গেছে তুমি কি জান না মূর্খ!' দু-হাত দিয়ে জোরে চোখ চেপে ধরে আছে নীরদ, যাতে পাতা দুটো খুলে না যায়, প্রতিমাকে দেখতে না হয়।

॥ আগামীবারে সমাপ্য ॥

শরৎচন্দ্র

কাজী আব্দুল ওদুদ

একালে উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা সাহিত্যে তার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে, এ-বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকরা মোটের উপর একমত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেও কোনো-কোনো কাহিনী-জাতীয় রচনায়—বিশেষ করে "আলালের ঘরের দুলালে"—চরিত্র সৃষ্টির উদ্যম চোখে পড়ে; তবু সে সব পুরোপুরি উপন্যাস হয়ে ওঠেনি, কেননা, জীবনের চিত্র কিছু-কিছু থাকলেও সে সব প্রধানত উদ্দেশ্যমূলক। 'প্রধানত উদ্দেশ্যমূলক' এই কথাটির দিকে আমরা বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভালো উপন্যাসেও উদ্দেশ্য যে কখনো-কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তা নয়; তবু জীবনের চিত্রই—জীবনের বিচিত্র আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিত্র—তাতে চোখে পড়ে বেশি। এর বহু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন দেশের সুপরিচিত সাহিত্যগুলো থেকে দেওয়া যেতে পারে। আমরা যে-আলোচনা আরম্ভ করেছি তাতেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

উপন্যাসে চাই জীবনের ব্যাপক আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিত্র—এই বিষয়টি অনুধাবন করলে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরের বাংলা উপন্যাস, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে যাঁরা মন্তব্য করেছেন : বঙ্কিমচন্দ্র নীতি-উপদেশের দিকে প্রবণতা বেশি দেখিয়েছেন, বাস্তবতা-বোধের পরিচয় তিনি যা দিয়েছেন তাঁর পরবর্তী প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, বিশেষ করে শরৎচন্দ্র, তার চাইতে বেশি দিয়েছেন—এসব কথা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ"। নাম থেকেই অনুমান হয় সংসারে বিষবৃক্ষ কি সেটি লেখকের নির্দেশের বিষয়। গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন, "আমরা "বিষবৃক্ষ" সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" নীতি-উপদেশের দিকে লেখকের পক্ষপাত যে স্পষ্ট তা নিঃসন্দেহ। তবু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, রচনা হিসাবে "বিষবৃক্ষে"র মর্যাদা এই নীতি-উপদেশের প্রাচুর্যের জন্যই নয়; বরং এইজন্য যে এতে নগেন্দ্র, হীরা, সূর্যমুখী, কমলমণি প্রভৃতি নায়ক-নায়িকারা আমাদের সামনে দাঁড়ায় জীবন্ত মানুষেরই মতো। নগেন্দ্র ও হীরা তো দোষেগুণে বিশেষভাবে জীবন্ত, এমনকি সূর্যমুখী, যাকে আদর্শ সতীসাধ্বী জ্ঞানে অনেকে ভক্তি নিবেদন করে থাকে, তারও সাধ্বীত্ব কোনো অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনীর মতো করে আমাদের সামনে দাঁড় করানো হয়নি, দাঁড় করানো হয়েছে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত মানুষেদের একজনের কাহিনী হিসাবেই। তাতে সদ্‌গুণের মাত্রা কিছু বেশি দেখানো হয়েছে মিথ্যা নয়, কিন্তু তার অকৃত্রিম ভালোবাসার কদর স্বামীর কাছে হল না, সেই স্বামী আসক্ত হল অন্য স্ত্রীতে, এজন্য তার যে বুকফাটা বেদনা তারই অঙ্কনে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের কৃতিত্ব। তাঁর এই ধরনের মর্মস্পর্শী আর চিন্তা-উদ্রেককারী ছবি আঁকার ক্ষমতা থেকেই বুঝতে পারা যায় শুধু মানুষের বাইরের জীবনের ঘটনাবলী নয়, তার অন্তরের দুঃখ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, এসবের সঙ্গে লেখকের পরিচয় গভীর। নীতি-উপদেশের কথা তিনি অবশ্য প্রায়ই বলেন, কিন্তু তা বলেন মানুষের হিতৈষী হিসাবে—তাঁর রচনায় নীতি-উপদেশের চাইতে অনেক বড়ো ব্যাপার তাঁর এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কোনো ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে যদি সংগতভাবে এই উক্তি করা যায় যে তাঁতে বাস্তবতা-

বোধ কম তবে আসলে এই কথাই বলা হয় যে জীবন সম্বন্ধে কোনো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি। পর্যাপ্ত বাস্তবতা-বোধ যাঁতে নেই তিনি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নন, ঔপন্যাসিক তো নননই, এ-কথা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী কুশলী ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও পার্থক্য বাস্তবতা-বোধের গভীরতা ও অ-গভীরতা নিয়ে নয়, সে-পার্থক্য মূখ্যত যুগ ও পরিবেশের পার্থক্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগের মানুষ সে-যুগে বাংলাদেশে জোরালো হয়েছিল জাতির পুনর্গঠনের প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক দুইজন খ্যাতনামা বাঙালী হচ্ছেন কেশবচন্দ্র সেন আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের প্রথমজন জাতির পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়জন রাজনীতির ক্ষেত্রে। যাকে বলা হয় উদারমানবিক ও অ-সাম্প্রদায়িক জীবন-দর্শন তা কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ দুইজনকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকেও যে আকর্ষণ করেনি তা নয়; তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ছিল সাহিত্যপ্রতিভা বা শিল্পপ্রতিভা, অর্থাৎ যা সাধারণ ও ব্যাপক তাই নিয়ে তাঁর প্রধান কারবার নয়, তাঁর প্রধান কারবার যা বিশিষ্ট তাই নিয়ে, তাই দেশের বা জাতীয়জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে মনুষ্যত্ব-সাধনের কথাই ভাবেননি, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন দেশের হিন্দু-ঐতিহ্য, হিন্দু-রূপ, এসবের পানেও। তাঁর এই প্রবণতার অন্য কারণও ছিল—সেইটি প্রবলতর; তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিতদের একটি উল্লেখযোগ্য দল হয়ে পড়েছিলেন ইউরোপীয় রীতিনীতির অন্ধ ভক্ত—অন্তত এই-ই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল—তিনি রোধ করতে চেয়েছিলেন সেই গড্ডলিকা-প্রবাহ; বলতে চেয়েছিলেন, মানুষ এক হয়েও দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে বিচিত্র ও বিভিন্ন, সেই বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা উপেক্ষা করবার মতো বস্তু নয় আদৌ, উপেক্ষা করলে জীবন হয়ে পড়ে বন্ধনহীন ও রূপ-হীন, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে অস্তিত্ব-হীন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামনে চিরদিনই দেখা দেয় এই বড়ো প্রশ্নটি—জীবনের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ও বিশিষ্টের যোগাযোগ কেমন হবে, কী-রং কী-রূপ গ্রহণ করে তারা সার্থক হবে এইসব। বলা বাহুল্য, এইসব প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর যুগে-যুগে দেশে-দেশে শিল্পী-সাহিত্যিকরা দিয়েছেন—সব উত্তর যে সার্থক বা সন্তোষজনক হয়েছে তাও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরটি একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

তাঁর "চন্দ্রশেখর"-এর প্রতাপ ও শৈবলিনীর কথা ভাবা যাক। দুজনের ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিবাহিত হয়েও যৌবনে দুজনের প্রতি দুজনের প্রবল আকর্ষণ, এসব বঙ্কিমচন্দ্র আন্তরিকতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে এমন সংকট যে দেখা দেয় সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন—যেমন সচেতন দেখি পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রকে তাঁর "দেবদাস"-এ। কিন্তু এই সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কি? মনে হয় শরৎচন্দ্র এই সমস্যার কোনো কূলকিনারা দেখতে পাননি—পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন। তিনি তাই তাঁর অপরিসীম-বেদনা-কাতর অন্তর নিয়ে শুধু চেয়ে দেখেছিলেন দেবদাস আর পার্বতীর জীবনের মর্মচ্ছেদী ব্যর্থতা, আর চোখের জল ফেলেছিলেন। এই সমস্যার দুরূহতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও তুলারূপে সচেতন; কিন্তু সেই দুরূহতার কথা ভেবে তিনি নিরস্ত হতে চাননি। তিনি এর মীমাংসা খুঁজলেন প্রতাপ, শৈবলিনী আর শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর তিনজনেরই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের সহায়তায়। প্রতিদিনের জীবনে এই সমস্যার বিচিত্র মীমাংসা অথবা গোঁজামিল নিয়তই আমরা দেখি; বঙ্কিমচন্দ্রের মীমাংসাও—গুরু-গম্ভীর যোগবলের আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও—একটি গোঁজামিলই হল, কেননা, এর ফলে

শৈবলিনী যদি-বা কোনো রকমে চন্দ্রশেখরের ঘরণী হল (তাতে করে হিন্দু-বিবাহ অচ্ছেদ্য এই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রক্ষা পেলো) প্রতাপ বরণ করলে অকালমৃত্যু, যদিও কোনো দোষে সে দোষী নয়। এই মীমাংসায় বা কাহিনীর এই গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রও যে খুশি হতে পারলেন না তার পরিচয় রয়েছে রমানন্দ স্বামীর প্রশ্নে প্রতাপের অন্তিম হৃদয়োচ্ছ্বাসে—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালোবাসা বুঝিবে?"... ইত্যাদি। এর সঙ্গে আরো একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করবার আছে : শরৎচন্দ্রের দেবদাস-পার্বতীও শেষ-পর্যন্ত প্রতাপ-শৈবলিনীর মতো 'অহিন্দু' কিছু করলো না। এর কারণ কি? আমাদের বক্তব্য, এর কারণ আর্টে বিশেষের—এক্ষেত্রে বিশেষ হিন্দু-পরিবেশের—দাবির প্রবলতা। পরে শরৎচন্দ্র অবশ্য বহু দুঃসাহসের পরিচয় দেন। কিন্তু তখন যুগ ও পরিবেশের অনেক বদল হয়ে গেছে।

হয়তো প্রশ্ন হবে : শরৎচন্দ্র তাঁর দেবদাস ও পার্বতীর কাহিনী যেভাবে শেষ করলেন তাতে ভাবালুতা কিছু বেশি প্রকাশ পেলো—এটি তিনি লেখেন অল্প বয়সে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" তাঁর পরিণত বয়সের রচনা, তাতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর কাহিনী তিনি যেভাবে শেষ করলেন, তাঁর চিন্তাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাম্বিত হয়েও বলা যায় তাতে কল্পনার অদ্ভুতত্ব কিছু অসঙ্গত রকমে প্রকাশ পেলো; তবে কেন বলা হবে না বঙ্কিমচন্দ্রে বাস্তবতা-বোধ কম?

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কল্পনা মাঝে-মাঝে উদ্দাম ও অদ্ভুত হয়েছে এ-কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, সেটি অলৌকিক অদ্ভুত এসবের প্রতি তাঁর মজ্জাগত আকর্ষণের জন্যই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারও মূলে দেশের ও জাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ধারণাই। ধারণা, idea যে জবরদস্ত—অত্যাচারী—চিন্তাশীল মাত্রেই তা জানেন। তা কারণ যাই হোক কল্পনার উদ্দামতা অদ্ভুতত্ব এসব মোটের উপর দুর্বলতা—ভাবালুতার রকমফের। কিন্তু এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রে বাস্তবতা-বোধ যে গভীর তার পরিচয় তাঁর "চন্দ্রশেখর"-এ আমরা কিছু পেলাম, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও, বিশেষ করে মতিবিবি, হীরা, লবঙ্গলতা, অমরনাথ, ভবানন্দ, জেবউন্নিসা, হরবল্লভ প্রভৃতি চরিত্রের পরিকল্পনায় তা সুস্পষ্ট। মনুষ্য-চরিত্রের জটিলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে যথেষ্ট সচেতন সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে হয় না, যদিও সেই সঙ্গে স্বীকার্য যে বড়ো রকমের ত্রুটিও তাঁর সাহিত্যে ঘটেছে। কিন্তু সেই ত্রুটি বাস্তবতা-বোধের ত্রুটি নয়, তাকে বলা যায় প্রত্যয়ের ত্রুটি—জীবনের মহত্তর পরিণতি সম্বন্ধে চেতনার কিঞ্চিৎ ক্ষীণতা। শিল্পী হিসাবে তিনি হিন্দুকে আঁকতে চাইলেন—সেটি কিছুমাত্র অসঙ্গত কাজ হয়নি; কিন্তু হিন্দুও যে মানুষ, তাই পরিবর্তন তারও জন্য সত্য, আর অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গত, এমন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের স্রোতোধারায়ই সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, জাতির ও দেশের নব-নব সার্থক রূপান্তর ঘটে, আমাদের দেশের একালের জীবনের এই এক বড়ো প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁতে যোগ্যভাবে দেখা দেয়নি—অবশ্য আংশিকভাবে কখনো-কখনো দেখা দিয়েছে যেমন "আনন্দমঠ"-এ। সৌভাগ্যক্রমে এই সচেতনতা পরে আমরা ব্যাপকভাবে পাই রবীন্দ্রনাথে—তাঁর জীবন-দর্শন আর বিশ্বদর্শনের প্রভাবে আর একালের বৃহত্তর জগতের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ব্যাপকতর পরিচয়ের ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও কলাকৌশল অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চোখে ম্লান হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যে যে একটি বড়ো পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথের

প্রভাবে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এই উল্লেখ কর্তব্য যে বঙ্কিম-সাহিত্য আর শরৎ-সাহিত্য এই দুয়ের মধ্যে সেতুর কাজ করেছে একখানি বই—সেখানি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাস—এ-সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকরা একমত। "চোখের বালি"-র কিছু পূর্ববর্তী হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' বড় গল্প। সে-গল্পটিও বিখ্যাত। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য ও শরৎ-সাহিত্য অথবা আমাদের কথাসাহিত্য বঙ্কিমযুগ আর তার পরবর্তী যুগ এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যোগ্যভাবে সূচিত হচ্ছে "চোখের বালি" উপন্যাসখানির দ্বারাই, কেননা, নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও অধিকারের দাবি তাতে অকুণ্ঠিতভাবে করা হয়েছে। অবশ্য দাবির বেশি কিছু করা হয়নি—সেটিও 'বিশেষ পরিবেশের' গুণে এই আমাদের ধারণা—কিন্তু নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও অধিকারের কথা এতে যে অকুণ্ঠিতচিত্তে উচ্চারণ করা হল তারও ফল কম হয়নি, বাংলার একালের সাহিত্যে—এবং জীবনেও—তার পর্যাপ্ত পরিচয় আমরা পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালির" উপরে পড়েছে গ্যেটের *Elective Affinities* "স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী" উপন্যাসখানির প্রভাব এ-কথা আমরা অন্যত্র বলেছি। গ্যেটের "স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী"-কে তাঁর চরিতাখ্যায়ক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা বলেছেন ইয়োরোপের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আদি বই।†

"চোখের বালি" থেকেই শরৎচন্দ্র যে প্রথম বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেরণা পান সে-সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন,

> ..... বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সূতীক্ষ্ম আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলব না। কোনো-কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায় এ-কথা সত্য নয়। ঐ তো খান-কয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?‡

"চোখের বালি" থেকে শরৎচন্দ্র যেমন এক ধরনের প্রেরণা পান তেমনি তারও আগে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" বিশেষ করে তার 'রোহিণী' চরিত্র থেকে তিনি এক ধরনের প্রবল বিতৃষ্ণও লাভ করেন। 'রোহিণী' সম্পর্কে তাঁর পরিণত সাহিত্যিক জীবনে এই মন্তব্য তিনি করেন,

> আমার মনে আছে ছেলেবেলায় "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দু-সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রু-পরিপূর্ণ

† "কবিগুরু গোটে" দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।
‡ "জয়ন্তী উৎসর্গ" দ্রষ্টব্য।

হয়ে উঠেছে, মনে হয় তাঁর কবি-চিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে idea-র জবরদস্তি ছিল আমরা জেনেছি। তাঁর 'রোহিণী' চরিত্র সেই জবরদস্তির এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ত্রুটির বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ এমন জোরালো যে তা কাটবার ক্ষমতা কারো আছে তা' মনে হয় না। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক' প্রবন্ধও শরৎচন্দ্রের মনে বিরূপতা উৎপাদন করেছিল, তারও পরিচয় তাঁর লেখায় রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ভিন্ন আর এক ধরনের প্রভাবও তাঁর উপর পড়ে নব-যৌবনেই—সেটি সমাজতত্ত্ব, মানব-সমাজের প্রাচীন ইতিহাস, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেনসার, টাইলার প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের চিন্তা। 'নারীর মূল্য' লেখাটিতে তাঁর চিন্তা ভাবনার এই দিকটা ভাল রূপ পেয়েছে। তিনি নিজেও বহুবার বলেছেন, সাহিত্যের চাইতে বিজ্ঞানের বইপত্রই তিনি ঘেঁটেছেন বেশি। কিন্তু বইপত্র তিনি যতই ঘাটুন তাঁর সত্যকার অবলম্বন কোনো গ্রন্থ বা তত্ত্ব তেমন নয় যেমন তাঁর পরদুঃখকাতর হৃদয় আর তাঁর নিজের 'প্রচণ্ড' অভিজ্ঞতা। নিজের সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চন্দননগরে আলোচনা সভায় অনেক মূল্যবান কথা তিনি বলেন, তার থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

> ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার একটা ঝোঁক ছিল। মনের ভিতর থেকে একটা বাসনা হত—যা বাইরে পাঁচ রকম দেখছি শুনছি তার একটি রূপ দেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন লিখতে সুরু করে দিলাম। প্রথমটায় অবশ্য এর ওর চুরি করেই লিখতাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না।... বলেছি—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক—আমাকেও চার পাঁচ ব্যর সন্ন্যাসী হতে হয়েছিল। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করেন সবই করেছি। গাঁজা মালপো কিছুই বাদ যায়নি।.....
>
> বিশ বছর এইটা গেল। ঐ সময় খান কতক বই লিখে ফেললুম। "দেবদাস" প্রভৃতি ঐ আঠার-কুড়ির মধ্যে লেখা। তারপর গান বাজনা শিখতে লাগলুম। পাঁচ বছর ঐতে গেল। তারপর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানা দিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা তাই থেকে। এমন অনেক কিছু করতে হত যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়িনি। দেখতে থাকতাম, সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হতো। সমস্ত islandগুলো (বর্মা, জাভা, বোর্নিয়ো) ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়—smugglers, এইসব অভিজ্ঞতার ফল "পথের দাবী"। বাড়ীতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না। এঁরা করেন কি—বই থেকে একটা 'ক্যারেকটার' নিয়ে তাকেই একটু অদল বদল করে আর একটা ক্যারেকটার সৃষ্টি করেন। মানুষ কি তা মানুষ না দেখলে বোঝা যায় না। অতি কুৎসিত নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি যা কল্পনা করা যায় না। সে সব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভেতরে থাকতে লাগলো। আমার memoryটা বড্ড ভাল।...
>
> আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতা নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোনদিন ছিল না।...

> Concrete রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না। নিজের অভিজ্ঞতা চাই। পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়ীতে যে বই আছে তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই।...রূপের বর্ণনা স্বভাবের বর্ণনা (আমার) বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই,—বেশি নজর দিই না। আসলবস্তু, তার সত্তা বা মন যাহাই বলুন—সেটা মানুষের ভিতরটা। সেইটা উপলব্ধি করবার জন্য চাই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। আমার অভিজ্ঞতা কি করে সঞ্চয় করেছি তার details বলবার প্রয়োজন নেই—সব বলবার মতও নয়। মানুষ (সংস্কারবশতঃ বা দুর্বলতাহেতু) সে-সব সহ্য করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটায় (কবিতায়)* যেমন আছে (বিষ যেটা) সেটা শুধু আমারই উপরে পড়লো—তা থেকে যা বেরিয়ে এলো, সেটা সকলকে দিয়েছি (আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে)। অনেকে বলে থাকেন এবং rightly বলে থাকেন—আপনার চরিত্র পড়লে মনে হয় যেন এরা কল্পনার বস্তু নয়। আমার চরিত্রগুলির 90%basis সত্য। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে সত্যি মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্যি আছে যা সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই—যাই বললে অস্বাভাবিক, অমনি বদলে ফেলতে হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেছি তাই লিখেছি। তাই আমার ভয়ের কারণ নাই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললে আমি মানব না।...

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁর জাতির লাভ হয়েছে দুইটি বড় সম্পদ—একটি তাঁর অপূর্ব অভিজ্ঞতাভরা জীবন, অপরটি তাঁর সাহিত্য। তাঁর সেই জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হবার সুযোগ আজো তাঁর দেশবাসীর হয়নি। কবে হবে, অথবা আদৌ হবে কিনা তাও বলা কঠিন। কেননা, তত্ত্বের মতো তথ্যও যে মহামূল্য এ চেতনা আজো আমাদের দেশে ক্ষীণ। আমরা এই আলোচনায় তাই চেষ্টা করবো তাঁর যে সাহিত্য আমাদের লাভ হয়েছে প্রধানত তার মূল্য একটু বুঝে দেখতে।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের লেখা কয়েকখানি বই নষ্ট হয়ে গেছে। যা আছে তার মধ্যে থেকে দুখানি বেছে নেওয়া যাক তাঁর প্রথম জীবনের রচনার নিদর্শন হিসাবে—"দেবদাস", তাঁর আঠারো থেকে বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা, আর "শুভদা" তাঁর বাইশ বৎসর বয়সের লেখা। এই দুইখানি বই থেকেই অনেকখানি বোঝা যাবে শরৎচন্দ্রের সেই বয়সের চিন্তা-ভাবনার গতি আর বিশেষ করে তাঁর আঁকবার শক্তি তখন কেমন ছিল। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশ বৎসরের কাছাকাছি বয়সের মধ্যেই প্রতিভাবানরা তাঁদের প্রতিভার পরিচয় অনেকখানি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বছর একুশ বয়সের লেখা; গ্যেটের 'প্রমেথেউস' খণ্ড কবিতা প্রায় ঐ বয়সেই তিনি লেখেন।—"দেবদাস" পরবর্তী জীবনে কতখানি মার্জিত হয়েছিল তা জানা যায়নি; কিন্তু যে হয়েছিল তা অনুমান করা যায় এর পরের রচিত "শুভদা"র কথোপকথনের ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করলে—শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গি "দেবদাসে" অনেক বেশি স্পষ্ট। তবু দেবদাস ও পার্বতীর পাঠশালার

* জীবন-মন্থন-বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।—চৈতালি

জীবন, পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে কিছুদিন তাদের মাঠে-বাটে বনে-বাদাড়ে পাড়ায়-পাড়ায় উৎপাত করে বেড়ানো, বাঁধে নেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল ঘোলা করে পুঁটিমাছ ধরা আর জলে ডুবে ডুবে চোখ লাল করা, তাদের বাল্য জীবন ও বাল্যকালের ভালবাসা সম্পর্কে এইসব সহজ অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনাবিন্যাস—এসব যে তাঁর প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা ভাবা কঠিন; আর সেই জন্যই বিস্মিত হতে হয় এত অল্প বয়সে লেখকের মধ্যে প্রেম ও তার পরিণতি সম্বন্ধে এতটা তীক্ষ্ণ চেতনা দেখে। চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরবর্তী-কালে স্পষ্টতর রূপ লাভ করেছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

প্রেম সম্বন্ধে এই গভীর চেতনা "দেবদাসে"র বছর দুয়েক পরে লেখা "শুভদা"য় আরো স্পষ্টভাবে পাই—"শুভদা" যে প্রায় অমার্জিত অবস্থায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহের সম্পাদক আমাদের সে কথা জানিয়েছেন।. "শুভদা"য় প্রেমের নানা ধরনের চিত্র তরুণ লেখক আঁকতে চেষ্টা করেন, তা আমরা পরে দেখবো। এতে প্রেম সম্বন্ধে ধারণা যেখানে একটি লক্ষণীয় গভীরতা লাভ করেছে আর তার ফলে লেখকের বাণী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তারই দিকে আগে তাকানো যাক। গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা ললনা (বর্তমানে মালতী নামে পরিচিতা) শারদাচরণকে ভালবাসতো। সে ভালবাসাও অকৃত্রিম—পরবর্তী জীবনেও তার মন থেকে তা মুছে যায়নি। তবু সে-ভালবাসা তেমন কোনো গভীর পরিণতির দিকে যায়নি। কিন্তু জল থেকে যে তাকে উদ্ধার করলে সেই সুরেন্দ্রনাথের গভীর সমবেদনা, শ্রদ্ধা আর প্রাণঢালা ভালবাসা লাভ করে তার মন প্রেমের এমন এক উচ্চগ্রাম স্পর্শ করলো যে সুরেন্দ্রনাথের মর্যাদারক্ষার চিন্তা তার মনে সব চাইতে প্রবল হল, তারজন্য তার নিজের মান-মর্যাদা বিসর্জন দিতে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হল। সত্যকার প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক বা প্রেমিকার পক্ষে এমন আত্ম-বিলোপ—শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'আত্মবলিদান'—যে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বাইশ বৎসর বয়সের উক্তি এই—

> জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসিতে যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতেই হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম।...যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে, আমি উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি...আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার এ অশ্রু বিসর্জন ভগবান পদপ্রান্তে পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবনমুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপে পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

শরৎচন্দ্রের ভাষার শক্তি ও মাধুর্য পরে এর চাইতে অনেক বাড়ে, কিন্তু আত্মবিলোপকারী প্রেমের যে মর্যাদার কথা তিনি এখানে ভেবেছেন তার চাইতে তার উচ্চতর কোনো মর্যাদার কথা পরে তিনি ভাবতে পেরেছেন মনে হয় না। অবশ্য পরে জীবন সম্বন্ধে ব্যাপকতর চেতনার পরিচয় তিনি দেন তা যথার্থ। প্রেমে অকুণ্ঠিত আত্মবলিদান নরনারীকে

জীবনমুক্তির অধিকারী করে, শরৎচন্দ্রের এই যে প্রথম যৌবনের ধারণা এটি পরে পরে তাঁর ভিতরে কি পরিণতি পায় তা আমরা দেখবো।

"শুভদা"য় শরৎচন্দ্র চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় কেমন দিয়েছেন সেটিও বুঝবার মতো। চরিত্রগুলো আমাদের সুপরিচিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ে পুরুষ—ভাল, মন্দ, ভালয় মন্দে মেশানো, সব রকমেরই। কিন্তু সবগুলোই স্পষ্ট—যেগুলো অপ্রধান চরিত্র, যেমন কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী, বিন্দুবাসিনী, রাসমণি, এরাও যে একটি অপরটি থেকে পৃথক, তা সহজেই চোখে পড়ে। তবে চরিত্রগুলো খানিকটা type জাতীয়—এদের কেউ যে হঠাৎ নতুন কোনো ধারা নেবে তা যেন ভাবা যায় না। তবু লেখক এদের বিশেষ বিশেষ ভাবের পুতুল করেই গড়েন নি, এরা মোটের উপর বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়ে পুরুষই, অনেকখানি নির্জীব ও গতানুগতিক বটে,—কেননা সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন তাই, কিন্তু তবু প্রাণহীন বিশেষ-ভঙ্গি-যুক্ত পুতুলই এরা নয়। একটি চরিত্র নেওয়া যাক—শারদাচরণের পিতা হরমোহন। হরমোহন কৃপণ। তার ছেলেও তাকে কৃপণ ও অর্থপিপাসু বলেই জানে, তাই ইচ্ছা থাকলেও বিনা পণে ললনার ভগিনী ছলনাকে বিয়ে করবার কথা তার কাছে তুলবার সাহস তার হয়নি। সেই বৃদ্ধ বিষয়ী হরমোহনও যখন বুঝলো ছলনার বিবাহের পণ বাবদ হাজার টাকা কাউকে না জানিয়ে তারই মতো ছলনাদের প্রতিবেশী সদানন্দ তাকে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে তখন সে কিঞ্চিত লজ্জা বোধ করলো। অবশ্য সে-লজ্জায় কোনো ফল হল না; টাকা সে নিল।

আমরা বলেছি "শুভদা"র বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমিক জীবনের বিভিন্ন ছবি তরুণ শরৎচন্দ্র দেখেছেন। প্রথমেই নেওয়া যাক শুভদাকে। শুভদা একান্ত সেবাপরায়ণা পতিব্রতা গৃহস্থ-বধূ। যেদিন সুদিন ছিল সেদিন যেমন সে নিঃশব্দে অনলসভাবে সংসারের ও স্বামীর সেবা করতো, স্বামীর দুর্মতির জন্য যখন দুর্দিন নেমে এলো সেদিনেও দেখা গেল সে তেমনি সেরাপরায়ণা, অপদার্থ এমন কি অপরাধী স্বামীর প্রতিও কিছু মাত্র অভিযোগ তার নেই, বরং তার প্রতি তার মমতার মাত্রা যেন বেড়েছে। কঠিন অভাব-অনটনের মধ্যেও এমন অসাধারণ ধৈর্য আর স্নেহমমতা যাতে তাকে শরৎচন্দ্র যুগের অনেক লেখকই হয়তো দেবীর আসনে বসিয়ে স্তব-স্তুতি আরম্ভ করতেন। কিন্তু তরুণ শরৎচন্দ্র শুভদা সম্পর্কে কোনো উচ্ছ্বাস দেখান নি। তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত বাঙালী ঘরের এক অসীম-মমতায়-ভরা বধূ ও মাতাকে। অবশ্য আরো বহু মমতাময়ী নারী শরৎচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন, মমতাময়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে তেজোময়ীও তারা কম নয়, কিন্তু শুভদার মতো চরিত্রও যে আমাদের চোখে না পড়ে তা নয়। জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে সংস্কার হয়তো তার এমন সহ্য-গুণের মূলে। শরৎচন্দ্র অবশ্য সে সব কথার উল্লেখ করেন নি। নারীর মাতৃরূপ শরৎচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু হয়েছে আমরা জানি। শুভদা তাঁর আঁকা প্রথম স্মরণীয় মাতৃমূর্তি।

শুভদার জ্যেষ্ঠা কন্যা ললনার কথা বলা হয়েছে। ললনা যার আশ্রয় পেলো ও পরে বিবাহিতা স্ত্রী হল সেই সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রেও প্রেমের একটা দিক দেখানো হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ ধনী জমিদার, বিপত্নীক, গান বাজনায় আর নর্তকীর সংস্রবে তার দিন কাটে। তারই বজরায় হল ললনার স্থান। ললনা নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বললে তার নাম মালতী। দেখে মুগ্ধ হতে সুরেন্দ্রনাথের বেশি সময় লাগলো না। তবু কোনো অশোভন ব্যবহার মালতীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথ করলো না। মালতীর একান্ত ইচ্ছা সে কলকাতায় যাবে, শেষ

পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ তাতে রাজি হল। এদিকে যে নর্তকী মেয়েটি তার সঙ্গে ছিল সে একদিন নৌকোয় বেড়াতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে গেল। তার শোকে সুরেন্দ্রনাথ বিমনা হল—ভাবলো, কার পাপে এমন হল। ললনাকে সে কলকাতায় তার এক বন্ধুর বাসায় পাঠিয়ে দেবার আয়োজন করলো। কিন্তু ললনা যখন সত্যই যাবার জন্য পা বাড়ালো তখন সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধীর হল। তার গভীর প্রেমে ললনা সাড়া দিল। সুরেন্দ্রনাথ নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন, সে জানে সে ভোগী, প্রেমিক নয়, তাই চাইলো ললনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে; কিন্তু তাতে সুরেন্দ্রনাথের সম্মানের হানি হবে ভেবে ললনা আপত্তি করলে। সুরেন্দ্রনাথ তার সে আপত্তি শুনলো না। সদানন্দের সঙ্গে যখন তার দেখা ও আলাপ হল তখন সে বুঝলো সদানন্দ ললনাকে গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাতে সে ঈর্ষান্বিত হল না। সে ললনাকে বললো, আমি যে বিষ খেয়েছি সদানন্দও সেই বিষ খেয়েছে।

সদানন্দ চরিত্রটিও লক্ষণীয়। সে আধ পাগলা। তাই বলেই তাকে সবাই জানে। কিন্তু আসলে সে সংসারে খুব গা মাখাতে চায় না—রামপ্রসাদী গায় আর শক্তি অনুসারে পরের কাজে লাগতে চেষ্টা করে। তার স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ করেনি। তার কেউ নেই, সেজন্য উদ্যোগীও কেউ হয়নি। অত্যন্ত অভাবে পড়ে ললনা একদিন তার কাছে কিছু সাহায্যের জন্য গেল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না। সদানন্দ তার মনের ভাব বুঝলো, বুঝে সমাদর করে তার প্রার্থনার অতিরিক্ত অর্থ তাকে দিলে। ললনা তাকে ডাকতো সদা-দাদা বলে, দাদার মতোই তাকে ভালবাসতো ও ভক্তি করতো। সদানন্দের ব্যবহারও ছিল তার প্রতি সহজভাবে স্নেহময়, তার বেশি যে আর কিছু তা যেন সে জানতো না। কিন্তু আসলে এটি ছিল প্রেম—প্রেমের আত্মনিবেদন, প্রতিদানের কোনো আশা না রেখে।

"শুভদা"র হারান চরিত্রটি খুব বিশিষ্ট। তার সামান্য চাকরীর আয়ে সংসার এক রকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তার বারবনিতাতে আসক্তি নেশাভাঙ্ করা, জুয়া খেলা, এ-সব বিপদ ডেকে আনলো। তার চাকরীটি গেল। জেলে যাওয়া থেকে সে রক্ষা পেল মনিবের দয়ায়। কিন্তু তার চৈতন্য হল না, ভাবলে আর একটি চাকরী সহজেই যোগাড় করে নেবে। সে আশা অবশ্য তার পূর্ণ হল না। তখন দূরে দূরে ভিক্ষার চেষ্টা সে করালো, তাতেও ঘোরাফেরাই সার হল। পাড়া প্রতিবেশীদের যৎসামান্য দানে কোনো রকমে সংসার চলতে লাগলো। ওদিকে একটি ছোট ছেলে দীর্ঘদিনের ব্যারামে মরমর, কিন্তু সে-চেতনা হারানের নেই। সেই অবস্থায়ও স্ত্রীর কাছ থেকে দুই এক আনা চেয়ে-চিন্তে নিয়ে সে ছোটে গাঁজা-গুলি আর জুয়ার আড্ডায়। তার বড় মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিল, ছেলেটি ভুগে ভুগে মারা গেল, এ-সবে সে দুঃখী যে না হল তা নয়, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তার গাঁজা-গুলির আর জুয়ার নেশাই তার জন্য সার হল। সদানন্দের সাহায্যে তাদের সংসার চলতে লাগলো। বইখানির শেষে দেখা যাচ্ছে, হারান জানতে পেরেছে তার স্ত্রীর বাক্সে পঞ্চাশটি টাকা এসে জুটেছে। সে মুখে গায়ে কালি মেখে আর তার উপরে চুনের ফোঁটা দিয়ে মোটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে থেকে দরজা খুলে শুভদার কামরায় ঢুকে ভারি গলায় বাক্সের চাবি চাইলে। প্রথমে ভয় পেলেও শীগগিরই শুভদা সব বুঝলো। উঠে বসে বালিশের নীচ থেকে চাবির থোলো নিয়ে সামনে ফেলে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, "আমার বড় বাক্সর ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিয়ো—বাঁদিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে তাতে যেন হাত দিও না।" হারানের টাকা নিয়ে যাবার সময় সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে

মৃদুকণ্ঠে বললে, "নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙিয়ো।"

বোঝা যাচ্ছে হারানের শোধরানোর কোনো আশাই আর শুভদা রাখে না। আমরা দেখেছি শুভদাকে শরৎচন্দ্র আঁকতে চেয়েছেন এক মহনীয়া মাতা রূপে—মাতার অপরিসীম স্নেহমমতা তাতে, সেই সঙ্গে মাতার অপরিসীম বেদনা-বোধ আর ক্ষমা। কিন্তু হারানের চরিত্রের কি তিনি দেখাতে চেয়েছেন? হারানের চরিত্রে ভাল প্রায় কিছুই নেই। প্রথম দিকে তাতে একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, পরে তার অস্তিত্বও আর বুঝতে পারা যায় না। এর উপর বামনাইয়ের দম্ভবও যে একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আঁকা হয়েছে এক সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীন গেঁজেল আর জুয়াড়ী করেই—সেই সবের নেশাই তার জীবনে চরম ও পরম হল। কিন্তু এমন একটা অপদার্থকেও তরুণ লেখক এঁকেছেন যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে। কেন? বোধ হয় প্রধানত এইটি দেখাতে যে গাঁজা গুলি জুয়া এ-সবের নেশা এই দুর্বলবুদ্ধি অভাবগ্রস্ত লোকটাকে কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে গেল। দারিদ্র্য অশিক্ষা কদাচার এ সবের প্রভাবে আমাদের পল্লীর মধ্যবিত্ত জীবন কতখানি ভেঙে পড়েছে হারান যেন তারি একটা দৃষ্টান্ত। হারানকে তিনি ঠিক ঘৃণা করেন নি, কিন্তু পরে পরে আঁকা মন্দ চরিত্রগুলোকে, যেমন "দত্তা"র রাসবিহারী, "মহেশে"র ন্যায়রত্ন "দেনা পাওনা"র শিরোমণি, জনার্দন রায় এদের তিনি রীতিমতো ঘৃণা করেছেন।

"শুভদা" সম্বন্ধে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এর ভাষার উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো মত বা ধারণার প্রতি শরৎচন্দ্র নবযৌবন থেকেই বিরূপ ছিলেন। তবু তাঁর ভাষার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বাচন-ভঙ্গি আর 'সাধনা' ও নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র যুগের রবীন্দ্রনাথের ভাষার অপরিসীম লালিত্য তাঁর ভাষার গঠনে বিশেষ সহায়তা করেছিল মনে হয়।

"দেবদাস" ও "শুভদা" এই দুই উপন্যাসেই দেখা যাচ্ছে প্রেমে আত্মনিবেদন লেখকের বড় বিষয়। তাঁর যে এই কালের ধারণা, এমন আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়ে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়, তাও স্মরণীয়। এমন আত্মনিবেদনের বা আত্মবলিদানের ভিতর দিয়ে মানুষ জীবন্মুক্ত হয় কিনা—জীবন্মুক্তি ব্যাপারটাই বা কি—এ-সব দুরূহ প্রশ্ন। তবে মুক্তির অর্থ অবন্ধন, জীবন্মুক্তির অর্থ তেমনি হতে পারে দৈনন্দিন জীবনের বহু বন্ধন সত্ত্বেও একটা অবন্ধনের ভাব; মন যদি কোনো একটি কেন্দ্রে সংহত হয়, ক্ষুদ্র লাভালাভের চিন্তার দ্বারা বিক্ষুব্ধ না হয়, তবে এমন অবন্ধন বা স্থৈর্য বা পরোয়াভাব অনেকখানি লাভ হয় বটে। হতে পারে নব যৌবনে প্রেমে চিত্তকে এমন সংহত করতে পেরেছিলেন বলে পরবর্তী জীবনে শরৎচন্দ্র অমন সমবেদনাপরায়ণ আর নিপুণ পর্যবেক্ষক হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রথম যুগের "বড় দিদি" ও "চন্দ্রনাথে"ও দেখা যাচ্ছে আত্মভোলা প্রেমের দিকে তাঁর পক্ষপাত।

এই প্রথম যুগে শরৎচন্দ্রের অঙ্কন ক্ষমতাও মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়েছে, বিশেষ করে "বড় দিদির" প্রথম অংশে অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের মাধবীদের গৃহত্যাগ করে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। তবে তাঁর এই যুগের চরিত্রগুলো মোটের উপর অজটিল, তাদের মনের দ্বন্দ্বও তেমন জোরালো হয়ে দেখা দেয়নি।

একটি লেখায় আমরা শরৎ-সাহিত্যকে ভাগ করেছিলাম দুই বড় ভাগে—প্রাক-শ্রীকান্ত আর শ্রীকান্তোত্তর। এই বিভাগ মোটের উপর কাজের বলেই মনে হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের যে-সব নাম করা ছোট উপন্যাস, যেমন "বিন্দুর ছেলে", "বিরাজ বৌ", "পণ্ডিত মশাই", "বৈকুণ্ঠের

উইল", "পল্লী সমাজ", এগুলো বেরোয় "শ্রীকান্তে"র আগে। তাঁর বড় উপন্যাসগুলোর মধ্যে "চরিত্রহীন" শ্রীকান্তের পূর্ববর্তী, তবে বই আকারে বেরোয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্ব যে বৎসর বেরোয় সেই বৎসরে। তাঁর ছোট নাম করা উপন্যাসগুলোর মধ্যে "বামুনের মেয়ে", "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের পরবর্তী—তার প্রকাশের সন ১৯২০। বলা বাহুল্য এই বিভাগে আমাদের লক্ষ্য শরৎচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার ও অঙ্কন-ক্ষমতার গতি পরিণতির দিকে। প্রাক-শ্রীকান্ত যুগের উপন্যাসগুলোয় সাধারণত শরৎচন্দ্রকে দেখা যায় কিছু বেশি ব্যক্তি-সচেতন, অর্থাৎ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার মানসিক দ্বন্দ্ব, এই সব যন্ত্রের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার দিকে তাঁর নজর বেশি। কিন্তু "শ্রীকান্তে"র বিভিন্ন পর্বে ও সেই কালের অন্যান্য উপন্যাসে তিনি যে ব্যক্তি-সচেতন নন তা নয়, তবে সেই সঙ্গে, অথবা তার চাইতে বেশি, পরিবেশ-সচেতন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যার দিকেও বেশি যত্নশীল। তাঁর সবগুলো নাম করা উপন্যাসের আলোচনার সুযোগ যে আমাদের হবে না তা বলাই বাহুল্য।

আমরা বলেছি শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁর জীবনদর্শন ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জীবনদর্শন মানুষের চিন্তা ভাবনা, পছন্দ অপছন্দ, অনুভূতি-আবেগ, এ-সবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তাই ভাষায় স্পষ্ট রূপ পাবার আগেও তা অক্রিয় থাকে না। তাঁর জীবনদর্শনের একটি বড় সূত্র "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> ...মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত...তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডারটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটি কি একটিবারও মনে পড়ে না? এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন।

শরৎচন্দ্র বহুবার বলেছেন তিনি নাস্তিক, ধর্ম বলতে আমাদের দেশে যা বোঝায় তার বিশেষ কোনো আবেদন তাঁর কাছে নেই। তাঁর কথা মিথ্যা ভাবার দরকার করে না। কিন্তু এও সত্য যে আমাদের দেশে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার প্রভাব তাঁর উপরে কম নয়। "শুভদা"য় আমরা দেখেছি তিনি ভাবছেন, প্রেমে আত্মোৎসর্গ জীবন্মুক্তি ঘটায়—"শুভদা" লিখবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তা আমরা জানি; আর "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে দেখছি তিনি বিশ্বাস করেন, 'মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত—সীমাহীন আত্মার আসন'; অর্থাৎ মানুষের অন্তরে এমন কিছুর সন্ধান তিনি পেয়েছেন যা দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ বুদ্ধি বিচারের অতীত, যদিও বাস্তবের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি একথা তিনি জানেন আমরাও জানি। জটিলতা বাদ দিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় বলা যায়, মানুষের চেতন মনের মতো, অথবা তার চাইতেও তার অবচেতন মন বেশি শক্তিশালী, এটি শরৎচন্দ্রের একটি প্রবল ধারণা। তাঁর প্রাক-শ্রীকান্ত যুগের উপন্যাসগুলোয় মানুষের বিশেষ করে নারীর, চেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব তাঁর নিপুণ চিত্রণের বিষয় হয়েছে, সেই চেতন ও অবচেতন মনের কার্যকলাপের সঙ্গে অবশ্য মিশে রয়েছে তাঁর নায়ক নায়িকাদের যে পরিবেশে জন্ম সেই পরিবেশের ধর্মাচার, সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে মনোভাব বা সে সবের অদৃশ্য প্রভাব।

তাঁর বইগুলোর একটু বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা যাক, তাতে শরৎচন্দ্রের জগৎ, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর রচনা-কৌশল, এ সবের সঙ্গে অনেকটা সহজে আমরা পরিচিত হতে পারবো।

বিরাজ বৌ

"বিরাজ বৌ" প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এটি ঠিক কখন রচিত হয়েছিল তা আমরা জানি না; তবে এর ভিতরকার চিন্তা ভাবনা ও মনোভাব শরৎচন্দ্রের রচনার প্রথম যুগ-ঘেঁষা, কিন্তু লিপি-চাতুর্য, বিশেষ করে বিরাজের গৃহ ত্যাগের আগে পর্যন্ত, সুপরিণত। স্বামী ও সংসার নিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী পরম স্নেহময়ী বিরাজ গভীর সন্তোষেই দিন যাপন করছিল। কিন্তু তার সেই সুখের নাঁড়ে বাজ পড়লো স্বামীর অবিবেচনায়—সে সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে ভগিনীর বিবাহ দিলো—আর তারপর দেখা দিলো কয়েক বছর ধরে অজন্মা। অভাব অনটন আরো মর্মান্তিক হল বিরাজের স্বামী নীলাম্বরের অকর্মণ্যতার জন্য। মনের দিক দিয়ে সে সোনার মানুষ, পাড়ার দশজনের কাজে খাটতে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু অর্থ উপার্জন কেমন করে করতে হয় তার কিছুই সে শেখেনি—সে দিকে আগ্রহও তার নেই। বিরাজের চেতনা প্রখর, তাই দুঃখবোধও প্রখর, আর এ দুঃখ তার নিজের জন্য নয়, তার স্বামীরই জন্যে—যে স্বামীর গায়ে এতকাল সে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেয়নি। স্বামীর অবিবেচনাই এমন অনর্থের মূলে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরম স্নেহময়ী বিরাজ কারণে অকারণে কঠিন বাক্যবাণে স্বামীকে বিদ্ধ করে চললো। এই পরিস্থিতিতে আর এক বিপদ এসে জুটলো—জমিদার পুত্র রাজেনের চোখ পড়লো বিরাজের অসামান্য রূপের উপরে, সে বিরাজের দাসীর মারফত তার মনোভাব ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেলো, সঙ্গে সঙ্গে বিরাজদের ঘাটের ঠিক ওপারে বজরা বেঁধে চার করে মাছ ধরার বিপুল আয়োজন করলো, আর বিরাজদের পাড়ায় পাখি শিকার করে ফিরতে লাগলো। বিরাজ সব বুঝলো। একদিন তাদের ঘাটের কাছে বন্দুক হাতে রাজেনকে দেখে সে তাকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করলো। সেই দৃশ্য তার দেবর পীতাম্বরের চোখে পড়েছিল। সে বিকৃত করে সেই সংবাদ দিলো ভ্রাতা নীলাম্বরকে আর স্ত্রীকে কড়া শাসন করলো। নীলাম্বর এসব কথা আদৌ বিশ্বাস করলো না, উল্টে পীতাম্বরকে শাসন করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবে ও কটূক্তিতে সে জ্ঞানহারা হল। এক দুর্যোগের রাত্রিতে বিরাজ পাড়ায় বাগদিদের বাড়িতে চাল ধার করতে গিয়েছিল, ফিরে এলে নীলাম্বর তাকে অসতী বলে গালি দিলো, আর কথা কাটাকাটিতে রেগে শূন্য পানের ডিবা ফেলে মারলো। বিরাজ অপমানে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নদীতে ডুবে মরতে গেল। কিন্তু মনের বিকারে নদীতে ঝাঁপ না দিয়ে সে দাসীর সঙ্গে রাজেনের বজরায় গিয়ে উঠলো, সেখানে সন্বিৎ ফিরে পেতেই নদীতে ঝাঁপ দিলো। নদী থেকে সে কোনো রকমে উঠলো; দীর্ঘকাল হাসপাতালে তার কাটলো বাতশ্লেষ্মা-বিকারে; তারপর দৈবক্রমে স্বামীর দেখা পেলো বহু দুঃখ ভোগের পরে একচক্ষুহীন আতুর পথের ভিক্ষুক অবস্থায়। স্বামী তাকে পরম সমাদরে উঠিয়ে আনলো। অল্পদিনেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পূর্বে কোনো রকমে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সে বললে, "আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল—আর কিছু নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ—এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে।"

কাহিনীটি অতিশয় করুণ কিন্তু সাধারণ—ঘটনার বিশেষ কোনো চমক এতে নেই। কিন্তু এর বর্ণনা-কৌশল, বিশেষ করে বিরাজের গৃহত্যাগের আগে পর্যন্ত, অনবদ্য। সংলাপ সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার প্রকাশ-সামর্থ্য অসাধারণ—বিরাজ, নীলাম্বর, পীতাম্বর, পীতাম্বরের স্ত্রী মোহিনী, সবারই মূর্তি সেই মিতভাষণ ও বর্ণনার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সামনে।

কিন্তু এতখানি শিল্পকৌশল সত্ত্বেও এটি কি উঁচুদরের উপন্যাস হতে পেরেছে?

আমাদের ধারণা—পারেনি; বিরাজের লঘু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এতে যে করা হয়েছে শুধু সেই জন্যই নয়, এর বিষয়টি মোটের উপর সাধারণ—মানুষের মর্মকে গভীর ভাবে স্পর্শ করতে পারে এমন কোনো সংবাদ তাতে নেই। বিরাজের সাধ্বীত্ব, নীলাম্বরের সরলতা ও স্নেহময় প্রকৃতি, পীতাম্বরের সন্দেহপ্রবণতা, মোহিনীর মিত ভায, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, সবই আঁকা হয়েছে চিত্তাকর্ষক করে, একালের বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চরিত্রগুলো ও কাহিনীটি হয়তো বেশি চিত্তাকর্ষক তাদের বিশেষ বাঙালী ধরণ-ধারণ, বিশেষ সংস্কারের আবেদন, এই সবের গুণে। কিন্তু সেই প্রাদেশিকতাই এর উচ্চ মর্যাদার অন্তরায় হয়েছে। শিল্পে চাই বিশিষ্টকে, নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পে সেই বিশিষ্ট একই সঙ্গে হয়ে ওঠে প্রাদেশিক ও সার্বভৌমিক। "বিরাজ বৌ"-এর চরিত্রগুলো চমৎকার ভাবে প্রাদেশিক, কিন্তু সেই অনুপাতে সার্বভৌমিক কম।

"শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্বের অন্নদানী ব্রাহ্মণ দম্পতির বিশেষ করে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে তুলনা করলে বিরাজ বৌ চরিত্রটির প্রাদেশিকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই ব্রাহ্মণীও বাংলা দেশের এক কোণের এক অবজ্ঞাত মেয়ে, কিন্তু তার অপূর্ব মানবিকতার গুণে সে একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও সার্বভৌমিক হয়ে উঠেছে।

বিন্দুর ছেলে

"বিন্দুর ছেলে"কে সাধারণত বলা হয় বড় গল্প। কিন্তু আসলে এটি ছোট উপন্যাস। গল্পের অর্থাৎ ছোটগল্পের গঠন ও আবেদনের বিশিষ্টতা এতে নেই। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে দুই বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু যাদব তার সামান্য আয় দিয়েও মাধবকে ছেলেবেলা থেকে যত্নে মানুষ করে। ক্রমে মাধব উকিল হল ও দুপয়সা উপার্জন করতে লাগলো। যাদবই চেষ্টা করে এক ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিলো। দুই ভায়ের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এতখানি ছিল যে তারা ভুলে গিয়েছিল তারা সহোদর ভিন্ন আর কিছু, দশ জনেও সে কথা ভুলে গিয়েছিল। বড় বৌ অন্নপূর্ণা ছিল দরিদ্রের কন্যা, কিন্তু যেমনি সুগৃহিণী তেমনি স্নেহবতী। ছোট বৌ বিন্দুবাসিনীর ওরফে বিন্দুর রূপ দেখে সবাই খুশী হল; রূপের সঙ্গে সে প্রচুর অলঙ্কার ও অর্থও নিয়ে এলো, কিন্তু সেই সঙ্গে আনলো প্রচুরতর অহংকার আর অভিমান। তার ফিটের ব্যামো ছিল, সহজেই মূর্চ্ছা হতো। তার মেজাজ যে কখন খারাপ হবে সেই ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত থাকতো। কেবল তার ভাসুর তার সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করতো না; সে বলতো, "মায়ের আমার অমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ সে কি একেবারে নিষ্ফল যাবে? এ হতেই পারে না।"

বিন্দুর বয়স যখন বছর পনেরো তখন তার একদিন ফিটের উপক্রম দেখে অন্নপূর্ণা তার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যকে তার কোলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। ছেলে কেঁদে উঠলো, বিন্দু প্রাণপণ বলে নিজেকে মূর্চ্ছার কবল থেকে রক্ষা করে ঘরে চলে গেল। সেই থেকে বিন্দুর ফিটের এক ওষুধ পাওয়া গেল—অমূল্যকে মানুষ করবার ভার তার উপর পড়লো। অমূল্য বড় হয়ে খুড়ীকে মা আর মাকে দিদি বলতে লাগলো।

অল্পেই অস্থির হওয়া, বাড়াবাড়ি করা, এই ছিল বিন্দুর স্বভাব। অমূল্যকে মানুষ করা নিয়ে সে খুব ব্যস্ত হল আর তাতে অন্নপূর্ণার গড়িমসিপনা লক্ষ্য করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলো। অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠতে লাগলো যখন নতুন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাদের পিসতুতো ননদ এলোকেশী তার বছর ষোল বয়সের নরেনকে নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য

বাস করতে এলো। নরেন পড়ে ফোর্থ ক্লাসে, "মাস্টাররা হিংসা করে তাকে বছরের পর বছর একটা ক্লাসেই ফেলে রেখেছে।" সে ভালো "এ্যাক্টো" করতে পারে, আর "তার টেরিটা একটা দেখবার মত জিনিস।" এমন বয়ে-যাওয়া ছেলের সঙ্গ অমূল্যর জন্য কি ভয়ানক যে হবে বিন্দু তা ভেবে কূল কিনারা পেলে না। অন্নপূর্ণাকে সে বললে, "দিদি ওদের বিদায় করে দাও।" অন্নপূর্ণা বললে, "সে প্রস্তাব কর্তার কাছে করলে তিনি তার মুখ দেখবেন না।"

ক্রমে অমূল্যর দুষ্টুমি নষ্টামি প্রকাশ পেতে লাগলো। বিন্দুরও মেজাজ চড়তে লাগলো। বড় জার সঙ্গে তার কথাবার্তা এক রকম বন্ধ হল। একদিন বিন্দু অমূল্যর জামার পকেটে সিগারেটের টুকরো পেলো। কিন্তু যে দিন সে শুনলো অমূল্য নরেন ও স্কুলের আরো কয়েকটি বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশে এক উড়ে মালীর বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, মালীকে মারধর করেছে, সেজন্যে হেড মাস্টার তাদের ফাইন করেছেন, সে ফাইনের টাকা অমূল্য দিয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে, সেদিন তার ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। কথায় কথায় নানাভাবে তীব্র ভর্ৎসনা সে অন্নপূর্ণাকে করলো, শেষে বলে বসলো— ..."কার পয়সা খরচ কর সেটা দেখতে পাও না? কার রোজগারে খাচ্ছ পরচ সেটা জান না?"

বলেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অঘটন যা ঘটবার তা ঘটলো, অন্নপূর্ণা কেঁদে স্বামীকে সব কথা বললো আর শপথ করলো—"ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে বেটার মাথা খেতে হয়।"

বিন্দুদের নতুন বাড়িতে আত্মীয় স্বজন সবাই গেল কেবল গেল না তার ভাসুর যাদব তার জা অন্নপূর্ণা আর অমূল্য। যাদব প্রায় পাঁচ মাইল দূরে জমিদারের কাছারীতে নতুন করে আরম্ভ করলো তার বারো টাকা মাইনের চাকরী।

ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো দেখে বিন্দুর লজ্জা আর দুঃখের অবধি রইলো না—সে তার ভাসুরকে অত্যন্ত ভক্তি করতো, জাকেও খুব ভালবাসতো। যা তার স্বভাব নয় তেমন কাজও সে করলো—স্বামীর পায়ে ধরে বললো, "ওগো একটি উপায় করে দাও।" স্বামী বললে—"বৌঠানের কাছে যাও।...আমার পা ধরে সমস্ত দিন বসে থাকলেও উপায় হবে না।"

পীড়িত পিতাকে দেখতে বিন্দু বাপের বাড়ি গেল। সেখান থেকে মাধবের কাছে সংবাদ এলো বিন্দুর শক্ত ব্যামো। মাধব গিয়ে দেখলো বিন্দু মৃত্যু-শয্যায়, ওষুধ পথ্য সব বন্ধ করেছে।

মাধবের মুখে এই সংবাদ শুনে অন্নপূর্ণা কেঁদে উঠলো। যাদব পাগলের মতো হল, বললে,—"এমন হয় না মাধু,...আমি জ্ঞানে অজ্ঞানে কাউকে দুঃখ দিই নি, ভগবান আমাকে এ বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।"

তারা সবাই গিয়ে বিন্দুর বাপের বাড়িতে উপস্থিত হল। যাদব অশ্রুরোধ করে বললে—"বাড়ি চল মা, আমি নিতে এসেছি।...যখন এসেছি তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয় আর ওমুখো হব না; জান ত মা, আমি মিথ্যা কথা বলি নে।"

যাদব বাইরে গেলে বিন্দু অন্নপূর্ণাকে বললে, "দাও দিদি কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে।... আর ভয় নেই—আমি মরব না।"

"বিন্দুর ছেলে" বেরুলেই খুব নাম হয়েছিল। বিন্দুর কিছু অস্বাভাবিক চরিত্রের নিপুণ চিত্রণ ছিল এর এমন খ্যাতির মূলে, এই মনে হয়। একালে কিন্তু বিন্দুর চরিত্র

আমাদের খুব খুশী করতে পারে না, তার কারণ, তাতে ভাবালুতার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত। তার মনে স্নেহ যথেষ্ট, তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ন, কিন্তু সে সব তেমন সার্থক হতে পারে নি তার খেয়ালী আদুরে প্রকৃতির মধ্যে। সাহিত্যের কোনো কোনো বোদ্ধার মতে নিষ্পন্ন চিত্তগত রস সাহিত্যের বড় ব্যাপার। কিন্তু তা সত্য নয়। যা চিত্তিত হল তার গৌরব যদি তেমন না থাকে তবে শুধু চিত্রণের বাহাদুরি মানুষের মনকে বেশি দিন ভুলিয়ে রাখতে পারে না। "বিন্দুর ছেলে"তে সব চরিত্রই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চরিত্রগুলো অবশ্য মোটের উপর স্বল্প-প্রাণ—প্রাদেশিক বেশি; বোধ হয় এক মাত্র যাদব এতে কিছু মহাপ্রাণ বা স্মরণীয় চরিত্র। তার পরিকল্পনায়ও ভাবালুতা প্রচুর, কিন্তু সব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও একটি নগ্ন নির্বিরোধ স্নেহভরা সাধুআত্মার পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে। উপন্যাসে মন্দ চরিত্র, অদ্ভুত চরিত্র, দোষে-গুণে-মেশা চরিত্র ফুটিয়ে তোলা তত কঠিন নয়, কিন্তু সাধু চরিত্র ফুটিয়ে তোলা বেশ কঠিন কাজ। প্রাক-শ্রীকান্ত যুগের অন্যান্য উপন্যাসের মতো "বিন্দুর ছেলে"তেও প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের ভাল দিকটা শরৎচন্দ্রের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর সেই শ্রদ্ধা তেমন সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে মনে হয় না। বোধ হয় তার কারণ, জীবনে যা গভীরভাবে সত্য নয় সাহিত্যে তাকে সত্যকার মর্যাদা দেওয়া কঠিন।

হৃদয়, অর্থাৎ প্রেম-প্রীতিকে, শরৎচন্দ্র চিরদিন মানুষের মহামূল্য সম্পদ জ্ঞান করতেন। প্রাক-শ্রীকান্ত যুগে তাকেই যেন তিনি মানুষের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সম্পদ মনে করেছেন। তাতে প্রাক-শ্রীকান্ত যুগের বিশিষ্ট 'বাঙালী' চরিত্রগুলোর মধ্যে উষ্ণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা প্রচুর ভাবেই পাই। কিন্তু সেই সব চরিত্রের কতগুলো বা কটি শুধু প্রাদেশিক না হয়ে মহাপ্রাণ বা স্মরণীয়ও হতে পেরেছে?

পণ্ডিত মশাই

"পণ্ডিত মশাই" প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। কাহিনীটি এই : বড়াল গ্রামের বৃন্দাবন জাতিতে বোষ্টম, কিন্তু অবস্থাপন্ন লোক। সে বাংলা লেখাপড়া জানে, প্রতিবেশীদের লুকিয়ে ইংরেজিও কিছু শিখেছে। নিজের চাষ আবাদ নিজে দেখে; বাড়িতে একটি পাঠশালাও করেছে, বিনা বেতনে পাড়ার ছেলেদের পড়ায়, তাদের শ্লেট পেনসিল কিনে দেয়, তার বক্তব্য—দেশ জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের আগে করতে হবে, তারপরে গভর্নমেণ্টের কর্তব্যের কথা ভাবতে হবে। সে ভাবে তার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মতো মানুষ হয় ত দেশের ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যায়। তার পাঠশালায় একটি সর্ত আছে, প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্র প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্তত দুটি একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। সে হিসাব করে দেখেছে তার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে তাহলে বিশ বছরে সারা বাংলা দেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় এ দুরাশা, কিন্তু আবার ভাবে ভগবান মুখ তুলে চাইলে এ আশা পূর্ণ হতে কতক্ষণ।

আখ্যায়িকার আরম্ভ কালে এই আদর্শনিষ্ঠ পণ্ডিতের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে বিপত্নীক, সংসারে আছে তার মা আর বছর তিনেক বয়সের ছেলে চরণ। তার মায়ের একান্ত ইচ্ছা সে আবার বিয়ে করে। ছেলেবেলায় কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল—কুসুম ছিল এক দরিদ্র বিধবার মেয়ে কিন্তু দেখতে সুন্দরী। কুসুমের মায়ের নামে বদনাম রটে, তাতে বৃন্দাবনের পিতা আবার তার বিয়ে দেয়। কুসুমের মাও নাকি রেগে আর একজন বোষ্টমের সঙ্গে কুসুমের কণ্ঠী বদল করায়; কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেই সেই লোকটি মারা যায়। তখন

কুসুমের বয়স সাত বৎসর। সেই থেকে তার গরীব ভাই কুঞ্জর সংসারে সে আছে। পাঠশালায় সে ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছে—অনেকেই তার সই, তাদের কেউ কেউ বিধবা। কুসুম নিজেকেও বিধবা বলেই জানে, বিধবার মতোই থান কাপড় পরে। আখ্যায়িকার আরম্ভকালে কুসুমের বয়স ষোল, বৃন্দাবন তাকে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তার ইচ্ছা সে কুসুমকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে; তাদের সমাজে এতে বাধা নেই। তার মা প্রথমে তার বাবার কথা ভেবে আপত্তি করে; পরে সম্মত হয়। কিন্তু কুসুম সম্পূর্ণ অসম্মত। তার সইরা যে বলবে হাড়ি ডোমের মতো কুসুমের নিকা হয়ে গেল একথা ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দেয়। কুঞ্জরও একান্ত ইচ্ছা কুসুম বৃন্দাবনের ঘর করে, কিন্তু কুসুম তাকে আমলই দেয় না। বৃন্দাবন অবশ্য হাল ছাড়ে না।

বছর তিনেক পরে কথায় কথায় কুঞ্জ একদিন বৃন্দাবনদের সবাইকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতেরা কুঞ্জর বাড়িতে গিয়ে দেখলো কুঞ্জ বাড়িতে অনুপস্থিত। কুসুম এর কিছুই জানতো না, সে দশদিক অন্ধকার দেখলো। যা হোক বৃন্দাবনের বুদ্ধি বিবেচনায় সে যোগ্যভাবেই অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পারলো। বৃন্দাবন এমন শিক্ষিত ও ভদ্র দেখে তার প্রতি কুসুমের বিরূপতা কমলো। সেই দিন বৃন্দাবনের মা নিজের বালা কুসুমের হাতে পরিয়ে দিয়ে কুসুমকে আশীর্বাদ করলো। কিন্তু কয়েকদিন পরে কুসুম সে বালা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে। এতে বৃন্দাবন তার প্রতি কঠিন হয়ে তার দিক থেকে মন ফেরালো।

বৃন্দাবনের মা কুঞ্জর বিয়ের ঠিক করছিল; সেই সম্পর্কে বৃন্দাবন একদিন কুঞ্জদের বাড়ী এলো, তার সঙ্গে ছিল চরণ। চরণকে দেখে তাকে কোলে নিয়ে কুসুমের মধ্যেকার ঘুমোনো মা জেগে উঠলো। বৃন্দাবনকে সে দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে যেতে বললো, কিন্তু বৃন্দাবন তার কথা রাখলো না, বললে, "চরণকে খাইয়ে দাও।"

বৃন্দাবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ করে চরণকে বুকে নিয়ে কুসুমের পূর্বের সব বিরূপতা দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৃন্দাবন বললে, কুসুমকে নিজে তার মায়ের কাছে যেতে হবে, এ ভিন্ন অন্যপথ নেই। নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে স্বামীর ঘরে উঠবে এতে কুসুম রাজী হতে পারলো না, যদিও কুঞ্জর বিয়ের পরে তার দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত কুসুম পায়ে হেঁটেই বৃন্দাবনের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো, কিন্তু তখন বৃন্দাবনের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কলেরায় তার মা মারা গেছে, চরণও মারা গেছে; পাড়ার ব্রাহ্মণ ডাক্তার শত অনুনয় বিনয়েও চরণকে দেখতে আসেনি, কেননা, ডাক্তার-বাবুর মামা তারিণী মুখুজ্যের বাড়ীর কলেরার কাপড়-চোপড় বৃন্দাবন তার পুকুরে ধুতে নিষেধ করেছিল।

চরণের মৃত্যুতে বৃন্দাবনের চোখে সংসার শূন্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভগবানের মঙ্গলময়তায় আস্থা সে ফিরে পেলো—সে দেখলো চরণ বেঁচে থাকতে শুধু চরণের কথাই সে ভাবতো, কিন্তু চরণের মৃত্যুতে সে সকল শিশুর মুখেই চরণের মুখ দেখলো। সেই শিশুদের কল্যাণ-সাধন সে তার জীবনের ব্রত করলো। গ্রামে ভাল নলকূপের ব্যবস্থা করতে ও তার স্কুলের ব্যয় নির্বাহ করতে সে তার সব সম্পত্তি দান করে গ্রাম ত্যাগ করলো। কুসুম তার সঙ্গ ছাড়লো না। বললে, "অবহেলায় ছেলে হারিয়েছি, স্বামীকে হারাতে আর চাইনে।"

গল্প হিসাবে "পণ্ডিত মশাই" খুব সাধারণ। কুসুমের মনের দ্বন্দ্বও মোটের উপরে বিশেষত্ব-বর্জিত। চরিত্রগুলো সুস্পষ্ট, কিন্তু সাহিত্যিক বৈভবে অনেকখানি দীন।

বৃন্দাবনের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। এই সব কারণে উপন্যাস হিসাবে এটিকে বিশেষ মূল্য দেওয়া কঠিন। কিন্তু এতে লক্ষণীয় দুইটি ব্যাপার আছে, একটি পল্লীর উন্নতি, বিশেষ করে শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণা; অপরটি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের হৃদয়হীনতা ও অধোগতির এক শ্বাসরোধকর চিত্র।

শিক্ষা সম্বন্ধে বৃন্দাবনরূপী শরৎচন্দ্রের কিছু বক্তব্য আমরা জেনেছি; তাঁর আর একটি বক্তব্য এই : পল্লীতে যাঁরা শিক্ষা বিস্তার করতে যাবেন তাঁদের পল্লীর অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের ভিতরে আসন নিতে হবে, পল্লীর চিরাচরিত আচার, যেমন জাতিভেদ খাদ্যাখাদ্য আচরণীয়-অনাচরণীয় এসব সম্বন্ধে তাদের সংস্কার, তাঁদের মান্য করতে হবে, নইলে পল্লীর লোকদের হৃদয় তাঁরা জয় করতে পারবেন না কাজও তাঁদের এগোবে না। "পল্লী সমাজ"এ এ-সব কথা শরৎচন্দ্র আরো বিস্তৃতভাবে বলেছেন। আমরা জানি শরৎচন্দ্রের কাছে বিশেষ মূল্য অভিজ্ঞতার। এসব যে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ কথা তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কাল বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলায়। এক সময়ে যারা অত্যন্ত গোঁড়ামির পরিচয় দেয়, অন্য সময়ে তারাই হয় যথেষ্ট উদার। মনে হয় শরৎচন্দ্রের এই সব নির্দেশের মধ্যে একটি খুব কাজের কথা বাদ পড়ে গেছে, সেটি এই : কর্মীকে নিরহঙ্কার প্রীতিময় লোক-চরিত্রজ্ঞ এই সব হতে হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সর্বোপরি তাকে হতে হবে অকপট; নইলে কাজ তার দ্বারা হয়তো ঢের হবে কিন্তু আসলে সে সব অকাজ। অকপটকর্মী প্রথমে ব্যর্থ হতেও পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাফল্য তারই লাভ হয়। এর প্রমাণ শরৎচন্দ্র নিজে। তাঁর অকপট বাণীর প্রথমে লাভ হয়েছিল তাঁর ভর্ৎসনা, কিন্তু পরে সে দুর্দিন সম্পূর্ণ কেটে যায়।

ব্রাহ্মণদের প্রতিশোধ নেওয়ার যে চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় তা যেমন নির্বোধ তেমনি ভয়াবহ। এমন ঘটনা অবশ্য অহরহ ঘটে না, কিন্তু এ যে অতিরঞ্জন নয় তাও স্বীকার করতে হবে, আর সেই জন্যই ভাবতে হয় কি কারণে এতো বড় অধোগতি মানুষের হয়। শরৎচন্দ্র অবশ্য সে দিকটায় মন দেননি, তিনি শুধু দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন এই অমানুষিক চিত্র। শিল্পী হিসাবে তাতেই তাঁর কর্তব্য অবশ্য সুসম্পন্ন হয়েছে, কেননা প্রায় মূক থেকেও আমাদের হৃদয়-মনকে তিনি করেছেন মুখর। এমন চিত্রকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বললে ভুল করা হয়। এ এক ঘোর ট্র্যাজিডির রূপায়ন— এখানে শুধু অসহায় শিশু চরণের মৃত্যুই আমরা দেখছি না তার হন্তারকদের ভয়াবহ ধ্বংস-রূপও আমরা দেখছি।

বৃন্দাবনকে যে অনেকখানি আদর্শনিষ্ঠ করে শরৎচন্দ্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন তা আমরা দেখেছি। শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা অবশ্য তার মুখে আমরা শুনি, কিন্তু শিক্ষকরূপে তার আদর্শ নিষ্ঠার ছবি তেমন আমরা পাই না, পাই বরং কুসুমকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য তার ঐকান্তিক কামনার চিত্র। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তার আস্থার ছবিও তেমন ফোটেনি; চরণের মৃত্যুর পরে তার যে মূর্তি দেখি তা শোকবিহ্বল পিতার মূর্তি, সমর্পিতচিত্ত জ্ঞানী বা ভক্তের মূর্তি নয়। তার মুখে শরৎচন্দ্র এই যে কথাটি বসিয়েছেন, "আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষালাভ হল, তত বড় শিক্ষা পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না" এটি সত্যকার জ্ঞানের কথা তেমন নয়, এর প্রেরণা শ্মশান বৈরাগ্য থেকে। এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পরিবেশে এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমানীদের অবিশ্বাস্যরকমের মূঢ়তা ও হৃদয়হীনতা সহসা এক প্রলয় কান্ড ঘটালো এই অস্বাভাবিক করুণ ছাপটি আমাদের

মনের উপরে যে পড়ে এইটিই "পণ্ডিত মশাই" উপন্যাসখানিতে এক স্মরণীয় সম্পদ।

পল্লীসমাজ

"পল্লীসমাজ" প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। এটি শরৎচন্দ্রের খুব একখানি জনপ্রিয় বই। প্রাক্-শ্রীকান্তযুগের উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচাইতে নামকরা "চরিত্রহীন"। কিন্তু রচনা হিসাবে সেই যুগের উপন্যাসগুলোর মধ্যে "পল্লীসমাজ"ই বোধ হয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

এত জনপ্রিয় বইয়ের কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে হয় না। এতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তিন অংশে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম, রমেশ ও রমার প্রেম; দ্বিতীয়, পল্লীর সমস্যার জটিলতা আর তার সমাধানের পথে বাধা; তৃতীয়, বাধার তিরোধান। রমা ও রমেশের প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতির কথা লেখক সংক্ষেপে বলেছেন, কেননা, যে-পল্লীসমাজের চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে সেই প্রেমের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আদৌ নেই। তাদের দুইজনের মধ্যে ছেলেবেলায় যে ছেলেমানুষী ভালবাসা ছিল রমেশ তা বিস্মৃত হয়নি, কিন্তু রমা বিস্মৃত হয়েছিল। বহুদিন পরে বিধবা রমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন রমেশ তাকে তার ছেলেবেলার নাম ধরে ডাকলো, তাতে সেই ভুলে-যাওয়া স্মৃতি যেন নতুন প্রাণ পেলো রমার মধ্যে। কিন্তু পল্লীসমাজের সঙ্গে রমা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাই পল্লী-সমাজের অন্যতমা নেতৃরূপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে পল্লীর সংস্কারকামী রমেশের বিপক্ষে দাঁড়াতে হল। তার মন ও আচরণের বিরোধ চরমে পৌঁছলো যেদিন সে দুর্নামের ভয়ে রমেশের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো আর তার ফলে রমেশের ছয় মাসের জেল হল। নিজের এই অপরাধ তার মনে গভীর করেই বাজলো। শেষ পর্যন্ত রমেশের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে দেখে সে কিছু শান্তি লাভ করলো। তার ছোটভাই যতীনকে মানুষ করার ভার রমেশের উপর দিয়ে ভাঙা মন ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ করে সে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশী বাস করতে চললো। রমার প্রতি রমেশের প্রেম ছিল প্রথম থেকেই গভীর, কিন্তু শান্ত। রমার অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত শত্রুতায় সে খুব দুঃখ পেলো, সময় সময় দিশাহারাও হল, কিন্তু সে-প্রেম কখনো তার মন থেকে মুছে গেল না। শেষ পর্যন্ত সে রমার অবস্থার কথা বুঝলো ও তাদের দুরতিক্রম্য নিয়তিকে দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলো। রমা ও রমেশের প্রেম মুখ্যত প্রেমের নীরব আত্মনিবেদন, ভোগাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। রমেশ নানা-ভাবে নিপীড়িত হয়েও সে-প্রেমের অমর্যাদা করেনি। কিন্তু পল্লীর প্রধানদের চাপে পড়ে রমা রমেশের প্রতি তার প্রেমের অমর্যাদা করতে বাধ্য হল—তাতে জীবন তার জন্য হল দুর্বহ। শেষের দিকে তার অত কান্না দেখে কোনো-কোনো সমালোচক বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই কান্নার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে তার চরিত্র। বাইরে সে প্রতাপান্বিতা জমিদারকন্যা কিন্তু অন্তরে সে মার্জিতরুচি স্নেহময়ী নারী ভিন্ন আর কিছু নয়, তার নিষ্পাপ প্রেমাস্পদ তারই দুর্বলতায় অমন কঠোর শাস্তি ভোগ করলো, এ-দুঃখের সান্ত্বনা তার নেই।

কিন্তু এ-বইতে রমা ও রমেশের বেদনামধুর প্রেম-কাহিনীর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পল্লীসমাজের বিচিত্র সমস্যার উপর শরৎচন্দ্রের আলোকপাত আর সে-সবের সমাধান সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ। পল্লীসমাজে যে-বিকৃতি ঘটেছে তার রূপ রমেশরূপী শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েছে এইভাবে।

...দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া, কল্পনা করিয়া কতবার

ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে তো নিভৃত গ্রামগুলিতে সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে যাহা বহু-জনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজনে বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায় শুধু সেইখানে, সেইসব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙালীর সত্যকার ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায়রে! এঁকি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়িয়া নাই! নগরের সজীব চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোনো পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনোমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মতো রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্র আজিও সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র! কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতি-গন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে!...

চরিত্র ও জীবন্ত ধর্ম গ্রাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, পড়ে আছে শুধু তার মৃতদেহ; সেই 'বিবর্ণ বিকৃত মৃতদেহটাকে' যথার্থ ধর্ম জ্ঞান করে হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তার 'বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায়' কেমন করে অধঃপথে নেমে গেছে, তার এক অবিস্মরণীয় চিত্র শরৎচন্দ্র যে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন তাঁর পল্লীসমাজ উপন্যাস-খানিতে এতে তাঁর এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ হয়েছে। যাঁরা বলেন সাহিত্য প্রোপাগাণ্ডা নয় তাঁরা অর্ধসত্য উচ্চারণ করেন মাত্র। সাহিত্য একই সঙ্গে প্রোপাগাণ্ডা এবং তার অতিরিক্ত আরো কিছু। অল্প কথায় বলা যায়, সেই অতিরিক্ত আরো কিছু হচ্ছে লেখকের চিন্তা-ভাবনা বা জীবন-দর্শন আর তাঁর চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা। এই তিনের যোগ সুন্দর হলে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্ম হয় এ-কথা বলা চলে; অন্তত, বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে এই তিনের সুন্দর যোগ আমরা দেখতে পাই। পল্লীসমাজে এই তিনের যোগ কেমন হয়েছে দেখতে চেষ্টা করা যাক।

পল্লীসমাজ থেকে চরিত্র ও জীবন্ত ধর্ম যে অন্তর্হিত হয়েছে তার এক অতিশয় স্পষ্ট ছবি শরৎচন্দ্র আঁকতে পেরেছেন। বেণী, গোবিন্দ, ধর্মদাস, পরান—এরা সব মূর্তিমান অধর্ম, যা-কিছু সঙ্গত শোভন দশের হিতকর তাই এদের চক্ষুশূল, নিজেদের ক্ষুদ্রতম লাভের জন্য, এমন কি শুধু পরের ক্ষতি করার জন্য, এরা অন্যায় অধর্মের পথে অগ্রসর হয়। এদের শয়তানি অবিশ্বাসারকমে উৎকট। শুধু এক বিষয়ে এরা বড় খাটো—এরা অত্যন্ত ভীরু, সেই ভীরুতা না থাকলে এরা অমানুষ হতো। এই ভীরুতা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে; জ্যাঠাইমার মুখে তিনি বলেছেন—

'...যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তাহলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।'

এই চিন্তা থেকে অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্বন্ধে যে একটি বিশেষ মনোভাবের সৃষ্টি

তাঁর মধ্যে হয় তার পরিচয় আমরা পরে পাব।

বেণী, গোবিন্দ, ধর্মদাস, পরান—এরা যেমন পল্লীসমাজের অধর্মের মূর্তি তেমনি তার দুর্বলতা ও অসহায়তার মূর্তি আমরা দেখি ভৈরব আচায্যি আর দীনু ভট্টাচায্যির মধ্যে। বেণী-আদির ভয়ে ভৈরব তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার পরিত্রাতা রমেশের প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। দীনু ভট্টাচায্যিও এদের ভয়ে ভীত, কিন্তু তার গোপন আত্মাটি অজেয় রয়েছে—সে যে বড় গরিব, এক-রকম চেয়েচিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই দিন চালায় এ-কথা সে সহজভাবেই কবুল করে আর রমেশকে নিরিবিলি পেয়ে বলে, 'আমি বেশ দেখেছি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়াধর্ম আছে, নেই কেবল বুড়ো-ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর-একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে ছেড়ে দেয় না।' দীনু ভট্টাচায্যি একটি ছোট্ট চরিত্র, কিন্তু বড় সুন্দর করে আঁকা—দারিদ্র্য ও দুর্বুদ্ধি-লাঞ্ছিত পল্লী-জীবনের সে যেন এক গোপন কান্না। আরো কয়েকটি ছোট চরিত্র এতে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেমন, বাঁড়ুয্যেমশাই, মধু পাল, গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার বনমালী পাড়ুই, ক্ষেমি বামনী আর বিশেষ করে আকবর সর্দার। এরা প্রত্যেকে তাদের স্বল্প-পরিসরে প্রাণবন্ত, সেইসঙ্গে পল্লী-জীবনের বিচিত্র দিক প্রতিফলিত এদের মধ্যে। এমন সব ছোট্ট সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা চলে, No perfect thing is too small for eternal recollection.

এই হতভাগ্য পল্লীসমাজের মধ্যে চরিত্র ও ধর্মের প্রতিমূর্তি হচ্ছেন জ্যাঠাইমা। রমার মধ্যেও ধর্ম রয়েছে, কিন্তু পরিবেশের দ্বারা তা আচ্ছন্ন। জ্যাঠাইমার উপরে "গোরা"র আনন্দময়ীর প্রভাব স্পষ্ট; 'গোরা'তে পল্লী-জীবন সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে তা থেকে শরৎচন্দ্র প্রেরণা পেয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের নিজস্বতাও তাঁর "পল্লীসমাজে" যথেষ্ট রূপ পেয়েছে। জ্যাঠাইমা আনন্দময়ীর অনুকৃতি হননি, তাঁর জগৎ আনন্দময়ীর জগৎ থেকে ভিন্ন, তাই তিনিও কিছু ভিন্ন হয়েই উঠেছেন। আমাদের কোনো-কোনো খ্যাতনামা সমালোচক আনন্দময়ী, জ্যাঠাইমা এসব চরিত্রকে ভাবের পুতুল ভেবেছেন, তাঁদের চোখে এরা জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেটি তাঁদের দেখার ভুল। সাধু-চরিত্র আঁকতে গিয়ে অনেকেই ভাবের পুতুল বা বিবৃতিকর বক্তা দাঁড় করান তা মিথ্যা নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠত্বের এক প্রমাণ এই যে তাঁরা সাধু-চরিত্র প্রাণবন্ত করতে পারেন। আনন্দময়ী তো অপূর্বভাবে প্রাণবন্ত। তিনি একই সঙ্গে মহিম বিনয় সুচরিতা ললিতার মা আর সর্বজাতির সর্বদেশের মা। পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমা তত বড় মা হয়ে ওঠেননি। তিনি বেণী রমেশ রমা আর কুসুমপুর গ্রামের মা যেমন একান্তভাবে তেমন একান্তভাবে সর্বজাতির সর্বদেশের মা নন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অব্যাপক পরিসরে তিনিও প্রাণবন্ত ও সক্রিয়; তাঁর আপন ছেলে বেণীকে এতখানি ধর্মহীন দেখে তাঁর বেদনার অন্ত নেই, সেই বেদনাই রূপ পেয়েছে রমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর উক্তিতে—

(বেণীর) মাথার ঘা সারতে বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।...এতে তার ভালই হবে...ভাবছ, মা হয়ে সন্তানের এতবড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কেমন করে বলছি?- কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি মা, এতে আমি ব্যথা পেয়েছি, কি আনন্দ পেয়েছি তা বলতে পারিনে।...কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

একজন সাধারণ মা এ-কথা কিছুতেই বলতে পারতেন না। কিন্তু জ্যাঠাইমার মধ্যে

যে শুধু মায়ের বেদনা নয়, ধর্মেরও গভীর বেদনা।

জ্যাঠাইমার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ব্যক্ত করেছেন। "পণ্ডিতমশাই"তে সে-দর্শনের সঙ্গে আমরা কিছু পরিচিত হয়েছি, পল্লীসমাজে তাঁর বক্তব্য আরো খানিকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে। অবশ্য দেশের জীবনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর আসল মত কি সেটি কিছুটা জটিল, তাঁর "শেষপ্রশ্ন" ও "বিপ্রদাস"-এর আলোচনা কালে তা আমরা দেখবো; পল্লীসমাজে তাঁর বক্তব্য মোটের উপর এই, জাতিভেদ ছোঁওয়াছুঁয়ি এসবের ফলে হিন্দুসমাজের দুর্দশা দেখা দিয়েছে কিনা এসব প্রশ্ন অগ্রগণ্য নয়, অগ্রগণ্য প্রশ্ন হচ্ছে পল্লীর সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালা, তাদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, তাদের অভীত করা। জাতিভেদ ছোঁওয়াছুঁয়ি এসবের বিরুদ্ধে অভিযান ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চলেছিল; তাতে সুফল যা লাভ হয় তার সঙ্গে একটি কুফলও লাভ হয়—হিন্দুসমাজের সনাতনী আর সংস্কারপন্থীদের মধ্যে তাঁর রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি দেখা দেয়। এর পর অনেক চিন্তাশীল মনোযোগ দিলেন জাতিভেদ-আদি দূর করার দিকে নয়, শিক্ষার বিস্তার ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলনের দিনে নেতারা ও কর্মীরা জোর দিলেন পারস্পরিক সহযোগিতা আর আত্ম-নির্ভরতার ব্যাপক চর্চার উপরে—সঙ্গে সঙ্গে অভীত হবার মন্ত্রও দেশের লোকদের তাঁরা দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশের মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হল অস্পৃশ্যতা দূর করা, সমস্ত ভারতব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো আর বিশেষভাবে অভয়ের সাধনের দিকে। পল্লীসমাজ বার হয় অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে, কাজেই স্বদেশী আন্দোলনই শরৎচন্দ্রকে প্রেরণা জুগিয়েছিল মনে হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি—কাল বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাবও বদলায়। কালে কালে ছোঁওয়াছুঁয়ি অবজ্ঞাত তো হয়েছেই, জাতিভেদের প্রতাপও শিথিল হয়েছে—সনাতনপন্থীদেরও মধ্যে। শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান আজ আমাদের হতে হয়েছে। কাজেই শরৎচন্দ্রের পল্লী-সংগঠনের কার্যক্রম আজ সহজেই অপূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হবে। তবে তিনি জনসাধারণের সংঘবদ্ধতা ও অভয়-সাধনের উপরে যে জোর দিয়েছিলেন তার মর্যাদা আজও অম্লান। মানুষের, বিশেষ করে অত্যাচারিতদের, সত্যকার প্রেমিক তিনি, তাই তাদের উদ্ধারের এই বড় উপায়টির মর্যাদা সহজেই তিনি বুঝেছিলেন।

পল্লীসমাজের রমেশ শরৎচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সমস্ত বাংলা-সাহিত্যে একটি স্মরণীয় চরিত্র। সে বয়সে তরুণ, সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; মানুষকে সে বিশ্বাস করে অতি সহজে, আর সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হলে মনে আঘাতও পায় বেশি। কিন্তু এই অপরিণত তরুণের হৃদয়টি অসাধারণ,—সবার জন্য তার অন্তরে প্রেমপ্রীতি রয়েছে, প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও কারো চাইতে উচ্চতর আসন সে দাবি করে না—সে-আসন যদি কেউ তাকে দিতে চায় তবে সে কুণ্ঠিত হয়। মানুষের নীচাশয়তা ও নষ্টামির পরিমাণ দেখে মাঝে মাঝে সে ধৈর্য হারায়, কিন্তু তার অন্তরের প্রেমপ্রীতি সহজেই তাকে তার প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে ফিরিয়ে আনে। "শ্রীকান্তে"র ইন্দ্রনাথ কোনো-কোনো বিষয়ে রমেশের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী; কিন্তু ইন্দ্রনাথকে দেখে আমরা বিস্মিত হই, রমেশকে আমরা ভালবাসি, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও করি। অপরিণত চরিত্র বিন্দু আমাদের সহানুভূতি কিছু আকর্ষণ করে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, কিন্তু অপরিণত রমেশ আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা দুই-ই আকর্ষণ করে, কেননা, সে বিকাশোন্মুখ—উদার আলো-বাতাসের দিকে তার অন্তরাত্মার অভিসার। সাহিত্যিক-সৃষ্টির উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করতে হয় জীবনের দিকে তাকিয়েই। জীবনে যা মহৎ সাহিত্যেও তাই-ই মহৎ।

পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্রের বক্তব্যকে আমরা তিন অংশে ভাগ করে দেখতে চেয়েছি। প্রথম অংশ, অর্থাৎ রমা ও রমেশের প্রেম, সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, কিন্তু সেই বিবৃতি সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের মর্ম স্পর্শ করে; দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ পল্লীসমাজের সমস্যার জটিলতা আর তার সমাধানের পথে বাধার বিপুলতা—সেটিও তো অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গেই অঙ্কিত হয়েছে; কিন্তু এর তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ বাধার তিরোধান ও পল্লীর নবজীবন আরম্ভ, সেটি আমাদের কিছু খুশী করলেও পুরোপুরি খুশী করতে পারে না, কেন না, পল্লীর সাধারণ লোকদের একটু মাথা চাড়া দেওয়া ভিন্ন জাগরণের আর কোনো লক্ষণ বা ছবি তাদের মধ্যে তেমন আমরা দেখি না। অবশ্য সাধারণ লোকদের এই মাথা চাড়া দেওয়া তাদের জাগরণের একটি বড় লক্ষণ বলে মানতে হবে; কিন্তু এই মাথা চাড়া দেওয়াই যে আমাদের দেশের মতো জটিল পরিস্থিতির দেশে পর্যাপ্ত নয়, অসহযোগ আন্দোলনের পরের ইতিহাস থেকে তা আমরা জানি; বিশেষ করে বেণী যেভাবে মনের দিক থেকে কিছুমাত্র না বদলে শুধু ভয়ে রমেশের দলে ভিড়লো, আর তাতে রমেশও খুশী হলো, সেটি পল্লী-সংগঠনের ক্ষেত্রে সত্যই খুশী হবার মতো ব্যাপার নয়। তবে শরৎচন্দ্রের চিন্তায় এই একটি জটিল বন্ধ আছে—তাঁর চিন্তা অনেক সময়ে সোজা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভ্যুত-ভাবে একটা আপোষ করে বসে। হয়তো তাঁর ধারণা ঘোর বিরোধিতা যার সঙ্গে চলেছে সেও যদি প্রীতিপ্রার্থী হয় তবে তাকে প্রীতি দান করাই ভাল; তাতে কার্যসিদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা। "শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্বে সুনন্দা চরিত্রের আলোচনায় এটি আমরা দেখবো।

চিত্রের দিক দিয়ে "পল্লীসমাজ" অপূর্ব; কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে কিছু দুর্বলতা তাতে আছে এই আমাদের মনে হয়েছে।

চরিত্রহীন

"চরিত্রহীন" প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এর পঞ্চম সংস্করণে শরৎচন্দ্র এই ভূমিকাটি যোগ করেন,

"চরিত্রহীনে"র গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তারপর ওটা পড়েছিল। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।

"চরিত্রহীন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে ঢের। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই ভূমিকাটির দিকে কেউ যে তাকিয়েছেন তা মনে হয় না। এই ভূমিকাটি কিন্তু খুব মূল্যবান, তার কারণ, এতে "চরিত্রহীন" উপন্যাসখানির এক বিশেষ পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়টি এই যে এটি মোটের উপর শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত রচনা।

এর অপরিণতি সহজেই চোখে পড়ে গল্পটির গাঁথুনির দিকে তাকালে। কাঁচা নাটুকে ভঙ্গিও এতে প্রচুর। কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এটি যখন প্রথম "যমুনা" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই পাঠকদের মনোযোগ এর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে, অর্থাৎ বঙ্কিমোত্তর বাংলা উপন্যাসে, দুইখানি বই প্রভাব বিস্তারের দিক

দিয়ে অগ্রগণ্য হয়েছে—একখানি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি", অপরখানি শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন"। "চরিত্রহীনে"র অপরিণতি আর অসাধারণ প্রভাব দুয়েরই কথা আমাদের ভাবতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায় "চরিত্রহীন" তিনজন চরিত্রহীনের আর একজন চরিত্রবানের কাহিনী; সেই তিনজন চরিত্রহীন হচ্ছে সতীশ সাবিত্রী কিরণময়ী; আর চরিত্রবান হচ্ছে উপেন্দ্র। এরা ভিন্ন আরো বহু চরিত্র এই উপন্যাসে আছে, তাদের মধ্যে সতীশের ভৃত্য বেহারী, আর উপেন্দ্রের পত্নী সুরবালার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবু "চরিত্রহীন"কে মোটের উপর সতীশ সাবিত্রী কিরণময়ী আর উপেন্দ্রের কাহিনী বলা যেতে পারে।

গ্রন্থের নায়ক সতীশ মস্ত বড় জমিদারের ছেলে। বয়স বছর তেইশ, সুদর্শন, ব্যায়ামের দ্বারা গঠিত তার সুউন্নত বলিষ্ঠ শরীর সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এন্ট্রান্স পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি—সে জন্য কিছু মাত্র মাথা ব্যথা তার নেই। আখ্যায়িকার সূচনায় সে কলকাতায় এক মেসে থেকে হোমিওপ্যাথি পড়ছে, উদ্দেশ্য গ্রামে গিয়ে একটা ভাল দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র ও হাসপাতাল খুলবে। তার সম্বন্ধে তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের একটি মন্তব্য এই—

> রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটিও ঠিক তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের ন্যায় অন্যায়ের ধারণা সত্যযুগের মতোই থাকে, এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা-না-থাকার উপর আমি ত বেশী আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন, সেটা ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাংলা দেশে এসে জন্মেছে।

এ থেকে তার চরিত্রের অনেকখানি পরিচয় আমরা পাই, কিন্তু সবখানি নয়। এই অসাধারণ অকপটতা নির্ভীকতা আর হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে তাতে রয়েছে এক গভীর প্রেম-প্রীতির ক্ষুধা—প্রেমপ্রীতি পেয়ে ও দিয়ে সে যেন জীবনের পরম চরিতার্থতা লাভ করে। তার চরিত্রের এই দিকটা "চরিত্রহীন"-কারের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

গল্পের সূচনায় যে মেসে আমরা তাকে পাই সেখানে চাকরেরা তার একান্ত ভক্ত—তার দরাজ হাতের জন্য, আর বাবুদের কেউ কেউ তার ওপর রীতিমত অসন্তুষ্ট ঐ একই কারণে। মেসের ঝি সাবিত্রীর বয়স বছর বাইশ, বিধবা, কথাবার্তায় চাল-চলনে ঝি জাতীয় স্ত্রীলোকের মতো আদৌ নয়। সাবিত্রী মেসের সব বাবুরই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে, তারো মধ্যে সতীশবাবুর কাজ সে যে আরো একটু দরদ দিয়ে করে তা সতীশও বোঝে। সতীশ অনেক সময় এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা বুদ্ধিমতী মার্জিতরুচি ঝির কথা একটু ভাবে সে যে ঝি জাতীয় স্ত্রীলোক এ তার প্রত্যয় হয় না, কিন্তু সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে ঝি ভিন্ন আর কিছুই বলে না। সতীশ এই বয়সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। কিন্তু সেই বিদ্যা তার জন্য জুটিয়েছে এমন সব সঙ্গী যারা মদ্যপায়ী, এবং মদ্যপায়ী হলে আরো যে সব দোষ সাধারণত ঘটে সে সব দোষেও দুষ্ট। সতীশ মাঝে মাঝে মত্ত অবস্থায় মেসে ফেরে। কিন্তু সাবিত্রীর প্রভাবে সে মদ্যপান প্রায় ত্যাগ করেছে। বাসার ঝি হলেও নিজের অজ্ঞাতসারে সতীশ তাকে অনেকখানি সমীহ করে চলে। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর ব্যবহারেও মাঝে মাঝে এতখানি মাধুর্য প্রকাশ পায় যা সতীশকে অন্তরে

অন্তরে বিচলিত না করে পারে না। এমনি ভাবে বিচিত্র ছোট-খাটো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সতীশ বুঝতে পারে সে সাবিত্রীকে সত্যই ভালবাসে। একটা ঝিকে ভালবাসা অতিশয় অসঙ্গত এ চেতনা তাতে দেখা দেয়, কিন্তু মনকে সে বশে আনতে পারে না। সাবিত্রী সতীশকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে; তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারও করে; তাতে সতীশ ক্রুদ্ধ হয়ে সাবিত্রীকে বহু অপমানকর কথা বলে; সাবিত্রী সতীশকে স্পষ্টই বলে—

> একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে আর কালি মাখিয়ো না।

সতীশকে এড়াবার জন্য সাবিত্রী কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়।

সতীশ সাবিত্রীর খোঁজ না করে পারে না। সে সংবাদ পায় সাবিত্রী সতীশের ইয়ার বিপিনবাবুর আশ্রিতা হয়েছে। সংবাদটি অবশ্য ভুল। কিন্তু সতীশ মর্মাহত হয়। শেষে সে মনকে বোঝায় সাবিত্রী তাকে একদিনের জন্যও ছলনা করেনি। বরং পুনঃ পুনঃ সতর্ক করেছে, শুভ কামনা করেছে। সাবিত্রীর স্মৃতি শেষ পর্যন্ত তার জন্য হল এক অমূল্য গোপন সম্পদ—

> ...সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত সে-মুখে নাই! গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তার সেই অকৃত্রিম সেবা। এমন সে তাহার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে! নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই বা কি হইবে? তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ যে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত বড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল, তাহারই উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।
>
> চোখ বুজিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে মনে বলিল,.....ভগবান! কার হাত দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ তোমারি হুকুমে সাবিত্রী দাতা, আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক, মন্দ হোক সে বিচার আর যেই করুক আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জ্বালা, সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কৃতঘ্ন না হয়ে থাকি।

এর পর সতীশের পরিচয় হয় ব্যারিস্টার জ্যোতিষ রায় ও তার অনূঢ়া ভগিনী সরোজিনীর সঙ্গে—এরা সতীশের গুরু ও বন্ধু উপেন্দ্রের পরিচিত। সতীশের চাল চলনে বিদেশিয়ানা আদৌ ছিল না, তবু তার দিকে সরোজিনী আকৃষ্ট হয়, সতীশের মনও সরোজিনীর দিকে কিছু ঝোঁকে। রায়-পরিবারে সতীশ-সরোজিনীর বিয়ের কথা আলোচিত হতে থাকে। সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী শশাঙ্কমোহন খোঁজ করে সাবিত্রী-সতীশের ব্যাপার জেনে জ্যোতিষকে জানায়। সতীশকে জিজ্ঞাসা করা হলে সতীশ অকপটে বলে—

> ...সাবিত্রী কে আমি তা জানিনে...তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে...তবে একথা খুবই সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক, যদি নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম তাকে মাথায় করে রাখতুম।...

> যথার্থই আমি ভাল নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারো সংস্রব রাখা উচিত নয়...আমি ভেবেছিলুম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা ...জানাব। কিন্তু কোনদিন সে সুযোগ হল না, সে সাহসও ছিল না।...দোষ আমার। এ আমি প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই মনে আমার সুখ ছিল না...অথচ আমি কোন বিষয়ে কাউকে ঠকাইনি, ওসব আমি জানিও নে।

এতে সতীশ ও সরোজিনীর বিয়ের কথা যা চলছিল তা ভেঙে যায়, কিন্তু সরোজিনীর অনুরাগ টলে না। পিতার মৃত্যুর পরে সতীশ প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়। দেশের বাড়িতে ফলাও করে ডিসপেনসারি হাসপাতাল এ-সব খোলে আর এক তান্ত্রিক গুরু ধরে পঞ্চমকারের সাধনায় রত হয়। বেহারী প্রমাদ গণে সাবিত্রীর খোঁজে কাশীতে যায় ও তাকে নিয়ে আসে। সাবিত্রীর আগমনে সতীশের তান্ত্রিক সাধনা ঘুচে যায়। সতীশ পুরোপুরি জানতে পারে সাবিত্রী নিষ্পাপ, তার হৃদয়ে সতীশ ভিন্ন আর কারো স্থান নেই; সতীশ তার দিকে আকৃষ্ট না হয় এই জন্যই সে মিথ্যা বদনাম নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। সতীশের নিউমোনিয়া হয়। সাবিত্রী চিন্তিত হয়ে উপেন্দ্রকে চিঠি দেয়। এর মধ্যে উপেন্দ্রর সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেছে। তার স্ত্রী সুরবালার মৃত্যু হয়েছে, সে নিজেও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। পুরীতে গিয়ে সে জানতে পায় সতীশ যাকে ভালবাসে সেই সাবিত্রী বালবিধবা, তাকে তার ভগিনীপতি বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সাবিত্রী যখন টের পায় তার ভগিনীপতির মতলব ভাল নয় তখন তার আশ্রয় ত্যাগ করে সে মেসে চাকরি নেয়। সেই সূত্রে সতীশের সংস্পর্শে সে আসে ও তার একান্ত অনুরাগিণী হয়। কিন্তু তাকেও সে এড়িয়ে যায় ও জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করে। সাবিত্রীর চিঠি অনেক ঘুরে উপেন্দ্রর হাতে পৌঁছে। ততদিনে সতীশ আরোগ্য লাভ করেছে। একদিন উপেন্দ্র ও সরোজিনী তার বাড়ীতে এসে হাজির হল। উপেন্দ্র সাবিত্রীকে নিজের ছোট বোন বলে সমাদরে গ্রহণ করলো। ঠিক হল কালাশৌচ গত হলে সতীশ-সরোজিনীর বিয়ে হবে, আর সাবিত্রী নেবে উপেন্দ্রর শুশ্রূষার ভার। তাদের যাবার দিনে সতীশ বেঁকে বসলো, বললে, সে সাবিত্রীকে যেতে দেবে না, তাকে বিয়ে করবে। সাবিত্রী বললে,

> ...সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি বজায় করে রাখেন...এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করো না।

উপেন্দ্রর মৃত্যুশয্যায় সতীশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে,

> আমি ভাল নই, বহু দোষ, বহু অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন। বরঞ্চ আমাকে তুমি এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোনও লোভে, কোনও দুর্বলতায় তাকে না অস্বীকার করি যে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

উপেন্দ্র বললে,—সমস্ত জেনেই তোদের আমি এক করে দিয়ে গেলাম। সতীশ বললে,—আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুখী হতে পারবেন? সাবিত্রী উপেন্দ্রকে বললে,—সে ভার আমি নিলুম দাদা,—তুমি নিশ্চিন্ত হও। উপেন্দ্র বললে,—

> আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্য নয় সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।

উপেন্দ্রর আদেশের প্রভাব সাবিত্রীর উপরে কেমন হল সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য

এই—

> ...শুনিয়া পাষাণ-মূর্তির মত সাবিত্রী নত নেত্রে বসিয়া রহিল। আজ সতীশ আর একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমাত্র অধিকার রহিল না। তাহার ভাবনার, তাহার বাসনার, তাহার পরম সুখের চরম দুঃখের, তার দুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস পর্যন্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাহার অন্তরের দুর্জয় অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত-মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সতীশের পরিচয়ের সঙ্গেই আমরা সাবিত্রীর পরিচয় পেয়েছি। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রেরও অনেকখানি পরিচয়, বিশেষ করে তার শেষ জীবনের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জীবনের প্রথম দিকটার কথা আরো একটু জানতে হবে। উপেন্দ্র ছিল সতীশের চাইতে বয়সে কিছু বড়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, পশ্চিমের একটা বড় শহরে ওকালতি করতো। সতীশের বিরাট প্রাণ তার প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল—সে সতীশকে গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে, কিন্তু সতীশ তাকে একই সঙ্গে জানতো বন্ধু ও গুরু বলে। যাকে বলা হয় নীতিনিষ্ঠ নির্দোষজীবন উপেন্দ্র ছিল তার পূজারি, সে-জীবনের কোনো ব্যত্যয় সহ্য করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তার স্ত্রী সুরবালা ছিল স্বামী-অন্ত-প্রাণ, সংসার অনভিজ্ঞা, শিশুর মতো সরল, শাস্ত্রের কথা, দেবতা ও মহাপুরুষদের কথা সে সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো—তার এই অতিশয় ঋজু চরিত্র ও ধর্মবিশ্বাস তার স্বামী পরম প্রেমে নিরীক্ষণ করতো। সতীশ যে কুসঙ্গে মিশে মদ্যপান আরম্ভ করেছে তা সে জানতো না। সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের সম্বন্ধের কথা তার মেসের এক ভদ্রলোক তাকে জানায়। উপেন্দ্র প্রথমে সে কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সস্ত্রীক সতীশের বাসায় উপস্থিত হয়ে সে একজন ভদ্রগোছের যুবতী মেয়েকে দেখতে পায়; সতীশের পতন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে তৎক্ষণাৎ সে তার বাসা ত্যাগ করে। বহুদিন পরে অবশ্য সাবিত্রীর সত্যকার পরিচয় সে পায় আর তার অসাধারণ চরিত্রের জন্য তার প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়। উপেন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিল হারান। হারান দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে অন্তিম সময়ে উপেন্দ্রকে সংবাদ পাঠায়। উপেন্দ্র সতীশকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় হারানের ভাঙা বাড়ীতে উপস্থিত হয়। হারানের চিকিৎসার ত্রুটি হয় না, কিন্তু হারান তার ভাঙা বাড়ী বৃদ্ধা মাতা আর অসাধারণ স্ত্রী কিরণময়ীর ভার উপেন্দ্রের উপর রেখে পরলোক যাত্রা করে।

এই কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তার প্রথম জীবনের পরিচয় তিনি দিয়েছেন এইভাবে—

> ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর-যত্ন করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষা দান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই।
>
> ...যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহঙ্কারে দেহের কূল-উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, এ-কথা সে একবারো ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল না। স্বামী বলিতেন, সুখই জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ। দয়া, ধর্ম, পুণ্য এ-সমস্তই ওই উপলক্ষ। হয় ইহকালে, নয় পরকালে; হয় নিজের, না হয় পাঁচজনের; হয় স্বদেশের, না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে সুখের সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই জীবের কর্ম, এবং জানিয়াই হোক, না জানিয়াই হোক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে ফেলিয়া সমস্ত ভাল-মন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের সেদিকে চাহিয়া না। কিরণ, তুমি কেবল এইটি বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কিনা।

পণ্ডিত স্বামীর তত্ত্বাবধানে কিরণময়ীর পড়াশুনা ও বুদ্ধির চর্চা অনেক হয়েছিল, হয়নি হৃদয়ের চর্চা। সে ঈশ্বর পরকাল এসব মানতো না, মানতো ইহকাল—ইহকালের সুখ সুবিধা। তার স্বামীর চিকিৎসা করছিল এক নতুন পাশ করা ডাক্তার। কিরণময়ীর রূপ-লাবণ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হতে তার দেরী হয়নি, কিরণময়ীও তার আসান্তি লালন করে চলায় কোনো দোষ দেখেনি। তার পতন আসন্ন হয়ে এসেছিল, এমন সময়ে তাদের বাড়ীতে এল উপেন্দ্র ও সতীশ। হারানের সামান্য যা কিছু ছিল সব উপেন্দ্রের নামে উইল করে দেবার ইচ্ছা হারান জ্ঞাপন করলো। আড়ালে থেকে একথা শুনে উপেন্দ্রকে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে কিরণময়ীর বাধলো না। স্বামীর মুমূর্ষু অবস্থায় তার সাজ সজ্জার পারিপাটা দেখে সতীশ বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু উপেন্দ্র তার ক্ষোভের কারণ বুঝে বললো, কিরণময়ীর যাতে ক্ষতি হয় এমন কিছুই সে করবে না।

হারানের অন্তিম কালে কিরণময়ী যে প্রাণঢালা সেবা করেছিল তা দেখে সতীশ কিরণময়ীর মহাভক্ত হয়ে উঠেছিল। উপেন্দ্রও বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু কিরণময়ীর এমন পরিবর্তনের মূলে ছিল উপেন্দ্র আর উপেন্দ্র ও সুরবালার অপূর্ব দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী। সতীশ তাকে সেই সব কাহিনী বলেছিল। উপেন্দ্রকে দেখেই কিরণময়ী মুগ্ধ হয়েছিল, সেই সঙ্গে বুঝেছিল উপেন্দ্র অপ্রাপ্য, তার পবিত্রতা বজ্রের মতো কঠোর; কিন্তু উপেন্দ্র ও সুরবালার প্রেমের সংবাদ তাকে প্রেরণা দিয়েছিল নতুন করে স্বামীকে ভালবাসার সাধনায়। বিধবা হবার পরে একদিন সে সুরবালাকে দেখে এলো, সুরবালার সরল গভীর প্রত্যয় তার মতো পণ্ডিতারও অন্তর স্পর্শ করলো। সেই দিনই ফিরে এসে সে উপেন্দ্রের কাছে অকপটে ব্যক্ত করলো উপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা কেমন করে তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে। এই অনাথ পরিবারের জন্য একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করে উপেন্দ্র পশ্চিমে ফিরলো তার আশ্রিত একান্ত স্নেহাস্পদ পিসতুত ভাই সদ্য বি.এ. ফেল ও পুন পরীক্ষার্থী দিবাকরকে কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে রেখে।

কিরণময়ী ও অঘোরময়ী দুই জনেরই প্রচুর আদর যত্ন পেয়ে মুখচোরা দিবাকরের জীবন যেন বদলে গেল। সে দুই একটি মাসিক পত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা আরম্ভ করলো। সে সব লেখা কিরণময়ীর চোখে পড়তে দেরী হল না, কিন্তু তার সমাদর না পেয়ে পেলো উপহাস। এই সূত্রে কিরণময়ী তাকে জানালো কেমন করে সত্যকার সাহিত্য জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ করে, অপরের ধার করা ভাব থেকে কদাচ নয়। সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে কিরণময়ী মন্তব্য করলো :

সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা...এইজন্য নারীর বাল্যরূপ যদিবা মানুষকে আকৃষ্ট করে তাকে মাতাল করে না। আবার একদিন তার সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যায় তখনও ঠিক তাই...শুধু নারী নয় পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

এসব আলোচনা অবশ্য বুঝবার ক্ষমতা দিবাকরের ছিল না; তবু মনে তার পুলক জাগলো। বিশেষ করে কিরণময়ীর বিব্রত করা হাসি তামাসা, সান্নিধ্য তার ভিতরে যেন এক নতুন চেতনার উন্মেষ করলো।

অঘোরময়ী কিরণময়ী ও দিবাকরের এত মেলামেশায় গল্প গুজবে খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছিল; বিশেষ করে দিবাকরের দ্বারা তার কোনো কাজই আর হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন উপেন্দ্র এসে উপস্থিত হল; তার কাছে আদ্যোপান্ত ভাষায় কিরণময়ীর নামে অভিযোগ করতে অঘোরময়ীর রুচি বা বুদ্ধিতে একটুও বাধলো না। কিরণময়ী এসব কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না, নীরবে উপেন্দ্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করলো। উপেন্দ্র সে খাবার খেলে না, কিরণময়ীকে বললে, "আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।" কিরণময়ীও অবশ্য কড়া প্রত্যুত্তর করতে ছাড়লো না। উপেন্দ্র দিবাকরকে হুকুম করলে তখনই বাক্স-বিছানা বেঁধে তার সঙ্গে যেতে। অঘোরময়ীর অনুনয়ে সে রাত্রির মতো ও বাড়ীতে থাকবার অনুমতি সে পেল। উপেন্দ্র যখন এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন কিরণময়ী অপরের অগোচরে তার পা জড়িয়ে ধরে বললে,—"আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত মিথ্যে! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে!" "চুপ করুন! অনেক অভিনয় করেছেন—আর না" বলে অসহ্য ঘৃণায় উপেন্দ্র তার মাথাটা সজোরে ঠেলে দিলে, সে পা ছেড়ে দিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। "নাস্তিক! অপবিত্র, 'ভাইপার'!" বলে উপেন্দ্র দুকপাত না করে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।—সেই রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই অপমানে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান-হারা কিরণময়ী দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দাসীর সহায়তায় আরাকান-যাত্রী জাহাজে গিয়ে উঠলো। দিবাকর কিরণময়ীর অনুবর্তী হয়েছিল একপ্রকার দিশাহারা অবস্থায়। কিন্তু জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। দুই চক্ষে তার ধারা বইল।

কয়েকদিন ধরে আদর করে ধমকিয়ে প্রলুব্ধ করে কিরণময়ী দিবাকরকে বশ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সব চেষ্টা বৃথা হল। শেষে সে দিবাকরকে বললে দেশে ফিরে যাওয়াই তার উচিত। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রের কথা উঠলো। কথায় কথায় দিবাকর বললে, "কাল তুমি বললে, উপীনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল কোন্ রাগে যে এ-কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাইনে। হেতু তোমার হয়ত কিছু আছেই, কিন্তু সে-কারণ যাই হোক ও-মাথা হেঁট করার দুঃখ যে কত বড় তা যদি জানতে, অমন কথা মুখেও আনতে না। তা ছাড়া ও-সব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায়, তবে কোন দিন নিজেদের মাথা তুলবো আমরা কোন দিক চেয়ে?" উপেন্দ্রের মহিমময় চরিত্রের প্রতি দিবাকরের সীমাহীন শ্রদ্ধা কিরণময়ীর অন্তরে যেন এক বিপ্লব ঘটালো। উপেন্দ্রের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা বোধ করে কিরণময়ী নিজের জীবনের পথ ফিরে পেলো। দিবাকরকে রক্ষা করা এখন থেকে তার এক কাজ হল।

আরাকানে কিরণময়ীকে যেমন যুঝতে হল অভাব অনটনের সঙ্গে তেমনি দিবাকরের নবজাগ্রত কামনার সঙ্গে। তার লাঞ্ছনা যেদিন চরমে পৌঁছলো সেদিন সতীশ হাজির হল তাদের দুজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। তার মুখে তারা শুনলো সুরবালা গত হয়েছে, উপেন্দ্র কলকাতায় মরণাপন্ন অসুস্থ।

তারা কলকাতায় পৌঁছলে দেখা গেল কিরণময়ীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। পালিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নানরত মেয়ে পুরুষদের সে বলতে লাগলো,

ভগবান কি সত্যি আছেন,? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার? ভক্তি করতে পার? আমি পারিনে কেন?

সুদীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি খুলে কপালে পিঠে সর্বত্র ছড়িয়ে সে উপেন্দ্রের কামরায় হাজির হয়ে বললে,

...সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল, ভগবান আছেন! তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হত...

দিবাকরকে দেখে বললে,

তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুর পো, তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে...

উপেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললে,

ওকে তোমরা দুঃখ দিও না ঠাকুর পো, আমার হাতে ওকে যেমন সঁপে দিয়েছিলে, সে সত্য একদিনের জন্যে ভাঙিনি...আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুর পো, একটু খাবে? হয়ত ভাল হয়ে যাবে।...

শেষ অবস্থা ঘনিয়ে আসছে দেখে উপেন্দ্র সতীশকে বললে,

চোখে চোখে রাখিস ভাই যতদিন না আবার প্রকৃতিস্থ হন। কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অন্তরের আঘাত যে কত দুঃসহ হয়েছে সে উপলব্ধি করবার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত বড় নিদারুণ হোক, অত বড় বুদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

"চরিত্রহীনে"র প্রধান চরিত্রগুলোর ও কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পেলাম তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে ঘটনার বিন্যাসে সংলাপে ভাবালুতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছে এতে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অন্যান্য রচনায় প্রেমতন্ময়তার বা প্রেমে আত্মবলিদানের যেমন মহিমা কীর্তন করা হয়েছে এতেও তাঁর সেই চিন্তা প্রবল—হয়তো প্রবলতর—হয়ে দেখা দিয়েছে। সাবিত্রীর আত্মবলিদানের দিকে কি গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছেন তা আমরা দেখেছি, কিন্তু শুধু সাবিত্রী নয়, সুরবালা, উপেন্দ্র, বেহারী, সতীশ প্রত্যেকেরই আত্মোৎসর্গপরায়ণ ভালবাসা তিনি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। কিরণময়ীর জীবন প্রচলিত আদর্শের প্রতি বিরূপতায় ও সুখান্বেষণে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু শেষে সেও উপলব্ধি করলো উপেন্দ্রের প্রতি তার মনে যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল তার বুদ্ধির অহঙ্কার ও নাস্তিক্য নয় সেই আত্ম-বিলোপ-পরায়ণপ্রেমই তার জন্য জীবনের পথ। কিন্তু যত ভুল সে করেছিল তার দুঃসহ গ্লানি তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটালো।

কিন্তু স্পষ্ট বা প্রবল চিন্তার সাহিত্যে যতটা মূল্য তার চাইতে বেশী মূল্য চরিত্র-সৃষ্টির। সেই চরিত্র-সৃষ্টি "চরিত্রহীনে" অনেক ক্ষেত্রেই সুসম্পন্ন হয়নি। চরিত্রগুলোর মুখে কথা অনেক বসানো হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে বর্ণনাও কম দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই সব কথা বা বর্ণনা চরিত্র-প্রকাশক তেমন হয়নি। সতীশের কথা ভাবা যাক। লেখক দেখাচ্ছেন

সাবিত্রীর প্রতি তার অন্তরে যে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে তা গভীর, কতখানি গভীর তা সে নিজেও জানে না। অথচ সাবিত্রীর তরফ থেকে কিছু বাধা বা উপেক্ষা পেয়ে যত অপমানকর কথায় সে সাবিত্রীকে বিঁধলো তাতে এই পরিচয়ই কি পাওয়া গেল না যে ভালবাসা তার অন্তরে যতটা জায়গা পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী জায়গা পেয়েছে এক ধরনের অহমিকা? হয়তো বলা হবে—এই দুর্বলতা দিয়েই তো তাকে গড়া হয়েছে, তার বন্ধু ও গুরু উপেন্দ্রের উপর রাগ করে সে কিরণময়ীর কাছে যা তা বলেছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সে যত কটু কথা উচ্চারণ করেছিল তার চাইতে অনেক বেশী আপত্তিকর কথা সে সাবিত্রীকে বলেছিল। তাছাড়া সতীশকে লেখক যতগুলো উপাদান দিয়ে গড়েছেন অথবা যতগুলো উপাদান তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সে সবের মধ্যে বড় করে দেখেছেন তার ভালবাসার ক্ষমতা। গঙ্গার ঘাটে যেদিন সে সাবিত্রীকে স্মরণ করে সত্যকার শক্তি পেলো সেদিন তাতে সেই অসাধারণ ভালবাসাই আমরা দেখি, আর সাঁওতাল পরগণায় জ্যোতিষ বাবুদের বাড়ীতে যেদিন সে অকপটে স্বীকার করলো সাবিত্রী নিজের থেকে চলে না গেলে সে কোনোদিন তাকে ত্যাগ করতো না সেদিনও সেই পরিচয়ই আমরা পাই। অথচ এতখানি ভালবাসার ক্ষমতার সঙ্গে লেখক তাতে দেখিয়েছেন এক অত্যন্ত হীন ধরনের অহমিকা। সাবিত্রীর প্রতি এমন ভালবাসার সঙ্গেই তার মনে যে সরোজিনী স্থান পেলো এতেও তার চরিত্র ঠিক প্রকাশিত হয়নি। হয়তো বলা হবে জীবনে তো আমরা এমন বৈচিত্র্য বা অদ্ভুতত্ব দেখি। কিন্তু জীবন ও শিল্পের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। জীবনে অনেককেই আমরা ঠিক বুঝি না বা জানি না, কিন্তু শিল্পী যাদের আমাদের সামনে দাঁড় করান তাদের বোঝাবার জন্যই দাঁড় করান। তাদের মধ্যেও বৈচিত্র্য, দুর্জ্ঞেয়তা, এসব থাকতে পারে, থাকেও, কিন্তু এমন ইঙ্গিতও শিল্পীকে দিতে হয় যাতে তাঁর অত্যন্ত জটিল সৃষ্টিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে অনেকখানি স্পষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। সতীশ তার অপূর্ব প্রেম আর অদ্ভুত অহঙ্কার বা খেয়ালিপনা নিয়ে তেমন স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ায় না। হয়তো সে দাঁড়ায় মোটের উপর এক সদাশয় কিন্তু অনেকখানি খেয়ালী তরুণ রূপে; কিন্তু লেখক তো তাকে ঠিক সেইরূপ দিতে চান নি। তার ভিতরে এমন একটা হৃদয় মাঝে মাঝে তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে সে খেয়ালী এমন কি চরিত্রহীন হলেও আসলে উচ্চাঙ্গের তার চরিত্র, এই লেখকের বক্তব্য। কিন্তু তাঁর সেই বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাঁর যে একটা প্রধান চিন্তা—মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত, অর্থাৎ স্ব-বিরোধিতার আর অন্ত তাতে নেই—সেইটি তাঁর দৃষ্টিতেও সৃষ্টিতে এমন বিঘ্ন ঘটিয়েছিল মনে হয়।

তেমনি উপেন্দ্রের ব্যাপারেও। উপেন্দ্রকে যে কত মহৎ করে লেখক অঙ্কিত করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকান যাত্রার দৃশ্যে। তার মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে দিবাকর তো উপস্থিত বিপদ কাটিয়ে উঠলোই, কিরণময়ীও সেই মহত্ত্বের সামনে নতশির হয়ে ঘোর দুর্দিনে পথ পেলো। কিন্তু সেই উপেন্দ্রকে আগের অনেক দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকখানি অসহিষ্ণু নীতিবাদী। যত সহজে সে কিরণময়ীকে বলতে পারলো "আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে" যে জ্ঞান ও মনস্বিতা তাতে আরোপ করা হয়েছে তার অধিকারীর পক্ষে তেমন উক্তি অসম্ভব, কেননা তা শুধু অভদ্র নয়, অন্যায়। এত বড় একটা অন্যায় যে তার দ্বারা সংঘটিত হল সে চেতনাও পরে যোগ্য-ভাবে তাতে জাগেনি। এখানেও সেই "মন জিনিসটা অনন্ত" তত্ত্বের পরিচয়, অর্থাৎ মনের

অনন্ত স্ববিরোধিতার পরিচয়। কিন্তু জীবনে এটি এক বড় সত্য হলেও আর্টে এর প্রয়োগে সাবধান হতে হয়, কেননা আর্টে চরিত্র চাইই, না হলে আর্টের সৃষ্টি অনেকখানি অর্থহীন হয়।

বেহারী, সুরবালা, সাবিত্রী এদের চরিত্র মোটের উপর সুস্পষ্ট হয়েছে, বোধ হয় তার কারণ এদের চরিত্রে জটিলতা নেই। বেহারী ও সুরবালার চরিত্র তো জটিল নয়ই, সাবিত্রীর চরিত্রও জটিল নয়, কেননা, তার ভিতরে যেমন রয়েছে প্রেমপ্রীতি-উন্মুখ মন, তেমনি সেই মন পবিত্রতা-অভিসারী—সেই পবিত্রতা তার জীবনে যে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কেননা অপরের লোলুপ দৃষ্টি তার উপর পড়েছিল, সেই দৃষ্টি তার উপরে পড়তে সে খানিকটা দিয়েছিলও, এতেই সে নিজেকে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অযোগ্য মনে করে— যদিও সতীশকে ভালবেসেই সে জীবনের স্বাদ পায়। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সাবিত্রীর এবং শরৎচন্দ্রের আরো অনেক নায়িকার মনের এই দ্বন্দ্বে দেখেছেন এক ট্র্যাজিডি। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ট্র্যাজিডি জাতীয় হলেও পুরো ট্র্যাজিডি নয়, একে বলা যায় কিঞ্চিৎ ভাগ্য-বিড়ম্বনা—টমাস হার্ডী যাকে বলেছেন Life's little ironies সেই জাতীয় ব্যাপার। অভয়া মনের বলে এই ভাগ্য-বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠেছিল, রাজলক্ষ্মীকে কাটিয়ে উঠতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল, কাজেই শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের জীবনেও এই দ্বন্দ্ব ঠিক ট্র্যাজিডির রূপ নেয় নি—যে-রূপ নিয়েছিল ট্র্যাজিডির চাইতে সে-সব অনেক ছোটখাট ব্যাপার। বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের এক বিশেষ স্তরে বিশেষ কালে এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছিল, তারই নিপুণ ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। কিন্তু এ দ্বন্দ্বে এমন কিছু চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব নেই—ট্র্যাজিডিতে কিন্তু সেই চিরন্তনতা বা বিরাটত্ব অপরিহার্য।

বেহারী, সুরবালা, সাবিত্রী এদের সাধু-চরিত্র করে আঁকা হয়েছে তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এরা কি মহৎ চরিত্র? অর্থাৎ, শিল্পে মহৎ সৃষ্টি? এদের সুন্দর হৃদয় আমাদের খুশী করে, কিন্তু শিল্পে মহৎ তাই যা শুধু হৃদয়-ধর্মে মহৎ নয়, মনোধর্মেও মহৎ। এদের কি মনোধর্মে মহৎ বলা যায়? আমাদের ধারণা—যায় না। বেহারী বা সুরবালার মধ্যে কোনো মহৎ অর্থাৎ বৃহৎ মন যে নেই তা তো স্পষ্ট, সাবিত্রীর বহু দুঃখ-ভোগের ভিতর দিয়েও কোনো মহৎ মনের অর্থাৎ মনন-শক্তির জন্ম হয় নি। একটা অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা তার লাভ হয়েছে, তার নির্লোভতাও চমৎকার, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে প্রাদেশিক বেশী, সার্বভৌমিক কম। প্রাদেশিক বেশী বলেই তার ধারণা—"সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন।" "চরিত্রহীনে" কিছু পরিমাণে মহৎ চরিত্র অর্থাৎ মহৎ সৃষ্টি বলা যায় কিরণময়ীকে।

"চরিত্রহীনে"র চারটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে মাত্র সাবিত্রী অনেকখানি সুঅঙ্কিত। কিন্তু তেমন সুঅঙ্কিত না হয়েও কিরণময়ী একটি মহৎ বা অসাধারণ চরিত্র হয়েছে। অসাধারণ ভাবে বঞ্চিত তার জীবন, সেই সঙ্গে অসাধারণ রূপ-যৌবনের আর অসাধারণ মস্তিষ্ক-শক্তিরও সে অধিকারিণী। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার মনে জাগা স্বাভাবিক; কিন্তু তার এত ব্যর্থতা ও বিদ্রোহের মধ্যেও ঘুমিয়েছিল প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী। সেই নারী প্রথম জেগে উঠলো আর রূঢ় আঘাত খেলো অনঙ্গ ডাক্তারের সংস্পর্শে এসে; কিন্তু তারপর অনেকখানি সার্থক হল উপেন্দ্রকে দেখে। দিবাকরের সঙ্গে তার যে সব আলাপ-আলোচনা রং তামাসা তা কিছু পরিমাণে রং-তামাসা কিছু পরিমাণে বঞ্চিত জীবনের অজানিত দাহ। কিন্তু দিবাকরকে নিয়ে তার আরাকান-যাত্রাকে কি বলা হবে? তাকি শুধু

উপেন্দ্রের উপরে প্রতিশোধ? খানিকটা হয়তো প্রতিশোধ, কিন্তু সবটা নয়। তার পরিচয় রয়েছে আরাকান-যাত্রী জাহাজে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন সম্বন্ধে দিবাকরের সঙ্গে তার আলোচনায়। দিবাকরকে পরে সে যত বড় নাবালক দেখলো ততটা আশঙ্কা হয়তো আগে তার হয় নি। যাক, শেষে উপেন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধা ফিরে পেয়ে সে পথ পেলো এবং সে-পথে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হল। কিন্তু দেহটাকে বাঁচাবার জন্য তার, অথবা শরৎচন্দ্রের যে উৎকণ্ঠা অনেকেই তাকে অদ্ভুত ভেবেছেন, আমরাও তার বেশী আর কিছু ভাবতে উৎসাহ বোধ করি না। শরৎচন্দ্র বলেছেন তাঁর চরিত্রগুলোর শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব থেকে নেওয়া। তাঁর কথা অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু কল্পনা দিয়ে যে অবশিষ্ট দশ ভাগ পুরিয়েছেন সেই ফাঁক দিয়ে দেহের পবিত্রতা সম্বন্ধে এই অদ্ভুত সংস্কার তাঁর অনেক রচনায় অশোভন ভাবে মাথা জাগিয়েছে। দেহের পবিত্রতার জন্য এমন উৎকণ্ঠা সাবিত্রীতে অবশ্য শোভন, কিন্তু কিরণময়ীতে নয়, কেন না তার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন।—তাই এক কিরণময়ীর মধ্যে আমরা দুটি মানুষকে পাচ্ছি—বিদ্রোহী কিরণময়ী আর প্রেমনিষ্ঠ কিরণময়ী। শুধু সেইটিই অবশ্য আপত্তিকর নয়। আপত্তির ব্যাপার এইখানে এইটি যে এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগ ঘটেনি। বিদ্রোহী কিরণময়ীই অবশ্য অনেক বেশী প্রাণবন্ত। বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও "চরিত্রহীন" বাংলা সাহিত্যে একখানি স্মরণীয় উপন্যাস হয়েছে তারই গুণে।

"চরিত্রহীন" যে আমাদের এ কালের সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার অনেকটা কারণ কিরণময়ী, সতীশ, সাবিত্রী এর এই তিনটি দোষযুক্ত অথচ শক্তিশালী চরিত্র। কিন্তু শুধু এই প্রধান চরিত্রগুলোই নয় এর নামটিও অনেকখানি এর প্রভাবের মূলে। এই নামকরণের ভিতরে যে একটি সবল বিদ্রোহের একটি 'ডোন্‌ট্‌কেয়ারে'র ভাব আছে সেটি পাঠক-সাধারণকে স্পর্শ না করে পারেনি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সত্যকার কোনো বিদ্রোহ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তা ও জীবনাদর্শ এর দ্বারা প্রচারিত হয়নি। কিরণময়ীকে অর্থাৎ প্রথম দিককার কিরণময়ীকে, এক বিদ্রোহের মূর্তি মনে হলেও আসলে সে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মূর্তি; আর এর তিন প্রধান "চরিত্রহীনে"র ভিতর দিয়ে মোটের উপর কি কথা লেখক বলতে চেষ্টা করেছেন তা ব্যক্ত হয়েছে বইয়ের শেষের দিকে কিরণময়ীর প্রতি সতীশের এই উক্তিতে—

> একি সত্যযুগ যে, পৃথিবী শুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে? এ হল কলিকাল, অন্যায় অকাজ ত লোকে করবেই। তার কে আবার জমা-খরচ খতিয়ে বসে আছে? আমার উল্টো বিচার, তা ভালই বল আর মন্দই বল বৌঠান, আমি দেখি কে কি কাজ করচে। হারাণদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামী-সেবা সে ত আমিই চোখে দেখেচি! সেই তুমি হবে অসতী! এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।...

আগাগোড়াই শরৎচন্দ্র প্রচার করতে বা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন গভীর প্রেমপ্রীতি গভীর সমবেদনার বাণী। "শেষ প্রশ্ন"-এ এবং "পথের দাবী"-তেও তিনি অবশ্য কিছু বিদ্রোহ প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিসেম্বর, ১৯৫৭-এ প্রদত্ত শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতামালার প্রথম অংশ

আধুনিক সাহিত্য

যে বই বুকের ভিতর নাড়া দেয় তাকেই আমি সাহিত্য বলি। চালাক বইকে নয়। নতুন জিনিস শেখায় এমন বইকে নয়। ওসব হল উপরকার জিনিস; সংস্কৃতি আর শিক্ষার আস্তরণ ভেদ করে হৃদয়ে গিয়ে যে আঘাত করে, শুধু তাকেই আমি ভালো বই বলি। তাসে বই ছোটদের জন্য লেখাই হোক, কিম্বা বুড়োদের জন্য লেখাই হোক।

জনপ্রিয় হয়েছে বলেই কোনো বই সাহিত্য হয়ে যায় না। সাধারণ পাঠকের চোখে বড় সহজে চটক লেগে যায়। অবিশ্যি তার কারণ সাধারণ পাঠকের সাধারণ জীবনযাত্রায় রূপরসের বড় একটা অবকাশ নেই, কোথাও একটু রোশনাই দেখলে তাই সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়, ছোট ছেলে যেমন রঙিন খেলনা ভালোবাসে।

আবার সেই কারণেই কেউ যদি তার সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলোকে একটুখানি অতিরঞ্জিত করে, কিম্বা একটা কোনো অনভ্যস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে নিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরতে পারে, এমন ভাবে যাতে তাদের চেনা যায় অথচ কেমন একটা অপরিচিত ও অপরূপের ছোঁয়া লেগে থাকে, এমন হলে সে কাহিনী মর্মেও গিয়ে দোলা দেবে, মনে হবে জীবনের অনেক প্রবঞ্চনা, অনেক বিড়ম্বনার জন্য আকস্মিক ও রহস্যময়ভাবে ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল। তখনি সে বই লেখা সার্থক হয়ে উঠবে যখন যারা সাহিত্যের ভালোমন্দ কিছুই বোঝে না তাদেরো মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠবে। এই হল সাহিত্যের এক ধরনের পরীক্ষা; এই হল সাহিত্যের একটা দিক; যেখানে সাহিত্য দেশকালপাত্রে ভেদ না কোরে, একেবারে মানবত্বের মূলে গিয়ে হাত ছোঁয়ায়।

তবে আরেকটা দিকও আছে। সাহিত্যের জনপ্রিয় হবার দরকারই নেই। এমন কাব্য, এমন কাহিনীও আছে যাদের স্থান সাহিত্যের শীর্ষদেশে, কিন্তু যাদের মাধুর্য উপলব্ধি করতে হলে, যাদের অতল গভীরতায় অবগাহন করতে হলে, বিশেষ একরকম মন চাই, বিশেষ একরকম প্রস্তুতি চাই। এ ধরনের রচনা কখনো জনপ্রিয় হতে পারে না, কারণ সাধারণ লোক তাকে হৃদয়ঙ্গমই করতে পারবে না। কিন্তু প্ল্যাটিনামকে না চিনলে রূপো বলে ভুল হয়, তাই বলে তো আর তার দাম কমে যায় না।

যে সাহিত্য ছোটদের জন্য লেখা তাকে কিন্তু ঐ প্রথম শ্রেণীরই হতে হবে। প্রস্তুতি করতে গেলে শৈশবই কেটে যাবে। তবে ছোটদের চোখের মণিতে যেমন একটা নীল ছায়া লেগে থাকে, ছোটদের মনেও তেমনি একটুখানি মোহ লেগে থাকে যা দিয়ে শিশু সাহিত্যের সব রসটুকু আকণ্ঠ পান করতে তাদের অসুবিধা হয় না।

মুস্কিল হল রসবোধ থাকলেও রুচিভেদ থাকে না ওদের। ঠুনকো জিনিসকে হয়তো ভালো মনে হয়, খেলো জিনিসকে দামী মনে হয়। তাছাড়া এই হল রুচির ভিৎটুকু গড়ে দেবার সময়, ভালো-লাগার স্রোতের মুখটি ঠিক পথে ঘুরিয়ে দেবার সময়। তবে ভালো জিনিস পেলে আর তাদের মন্দ জিনিসে মন ওঠে না, এও হল একটা বড় সুবিধা।

ছোটছেলের মনের মধ্যেও মানবজাতির কতকগুলি প্রাথমিক শখ লুকিয়ে থাকে এবং এই সময় প্রাণ ভরে তাদের আশ এমনি করে মিটিয়ে দিতে হয়, যাতে যখন ছেলেমানুষির

বয়স চলে যাবে তখনো তার লাবণ্যটুকু মনে থাকবে। ছোটবেলায় ভালো দুধ ফল খেলে যেমন অস্থি মজ্জা এমনি সুস্থসবল হয় যে সারাজীবনের ধকল সইতে পারে।

এই প্রাথমিক শখগুলির মধ্যে প্রথমেই হল অজ্ঞাত অভিনব ও অপরূপের নেশা; প্রতিদিনকার জীবনে যার দেখা পাওয়া যায় না তাকে পাবার তৃষা; প্রতিদিনকার ব্যর্থতা, প্রবঞ্চনা, বিড়ম্বনার দুঃখ ভুলবার প্রবল প্রচেষ্টা। এ হল বুড়ো পাঠকের সাধারণ জীবনের বিষয় অসাধারণ উপন্যাস ভালো লাগার আয়নাটির অপর দিকটা। অনেকেই ছোট ছেলেদের মনের ভিতরকার অব্যক্ত, অকারণ, অসংগত ও যুক্তিবিহীন দুঃখব্যথাগুলোর ধার ধারেন না; কিন্তু তাই বলে সে দুঃখগুলো কিছু কম তীব্র হয় না। বিশেষ করে কৈশোরে, যখন ছোট-বেলাকার বিচারবিহীন গ্রহণ-করার পালা শেষ হয়েছে অথচ সাবালক বয়সের বোঝাপড়া করে নেবার ক্ষমতাটুকু গজায়নি। তখনই জীবনের ব্যর্থতাগুলো বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসে, মনগড়া অপরূপ সব ঘটনার মধ্যে ছাড়া না পেলে পৃথিবীটা, পৃথিবীর বাসিন্দারা, বিশেষ করে যারা অভিভাবকপদের তারা সকলে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই এই হল রোমাঞ্চকর উপন্যাস, অভাবনীয় অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও প্রবল উত্তেজনার কল্পনা-কবি-কাহিনীর সময়।

গুরুজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ছেলেমেয়ে বয়ে গেল, বখে গেল, পড়াশুনো চুলোয় গেল, অপরাধপ্রবণতা নিদারুণভাবে বেড়ে গেল এবং প্রতিরোধ করতে গেলে গুরুজনদের প্রবঞ্চনা করবার আশ্চর্য দুর্বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া গেল।

কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ ছেলেমেয়েদের এই মনোভাবকে বলেছেন পলাতক প্রবৃত্তি, এস্‌কেপিজম্‌, বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি নেই বলে তাকে এড়িয়ে বেড়াবার ইচ্ছা, এক ধরনের কাপুরুষতাও বলা যেতে পারে। বুড়ো চোখ দিয়ে ছোটছেলেকে যারা দেখে তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে, শিশুমনের সত্যি খবর যে রাখে সে জানে এ ঠিক তা নয়, এ হল সেই পুরানো ক্ষতিপূরণের কথাটার আরেকটা রূপ; বাইরে যা হবার নয় তাকে নিজের মনে তৈরী করে নেওয়া; বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রথম পদক্ষেপ; বাস্তব যা দিতে পারে না অবুঝের মতো বাস্তবের কাছ থেকে তারই জন্য বায়না ধরা ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ দেখা; এক কথায় এই অনির্বচনীয় অবাস্তবকে আঁকড়ে ধরার পিছনে রয়েছে স্থূল বাস্তবকেই মেনে নেওয়া। আর ছোট ছেলের বড় হওয়ার এই হল প্রথম পদক্ষেপ।

কাহিনী অবিশ্যি অবাস্তব না হলেও চলে। বাস্তবের মধ্যেই যদি সেই অপরূপত্বের দেখা পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তবে তার জন্য অন্য রকম চোখ চাই, অন্য রকম কান চাই, অন্যরকম মন চাই। যে চোখ ভাল্লুকদের হাসি দেখতে জানে, যে কান অন্ধকারের শব্দ শুনতে জানে, যে মন মানুষের বাস ছেড়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। "বাবির বন্ধু" যে লিখেছে তার মতো মানুষ। তবে "বাবির বন্ধু"-র সমালোচনা করতে গেলে একশ' রকম ভুলের কথাও বলতে হয়। বলতে হয় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত কাঁচা, গল্পকে কোথায় টানতে হয় কোথায় ছাঁটতে হয় মোটেই সে জানে না; দুটো কলমের আঁচড়ে মানুষের ছবি ফোটাতে পারে না; গোটা একটা ১২৪ পৃষ্ঠার বই লিখে ফেল্‌ল অথচ মিনির দিদিটি কেমনধারা মানুষ আদপেই বোঝা গেল না আর মিনি মেয়েটাই বা কোন জাতের মেয়ে, মা বাবা আর ঠাকুমা ছাড়া কারো উপর এতোটুকু টান নেই! সব সময় কেবল নিজের তালেই আছে, আর যতো ভালোবাসা ঐ সব জন্তুজানোয়ারদের জন্য! তাও যদি ভালো জানোয়ার হোত, ভালো জাতের কুকুরগুলোর উপর সত্যি কথা বলতে কি একটু কৃপা মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছাড়া কিছু নয়! যত ভাবনা আর যত টান হল গিয়ে কিনা ঐ সব নেড়িকুত্তো আর নিজের-

ঘরের-মেজে-খুঁড়তে-ওস্তাদ খরগোস আর লোমওঠা খেমো খেমো বিল্লির বাচ্চা, আর বুনো একটা ভালুক ছানার জন্য, যাকে ভালোবাসতে গেলে ছাল তুলে নেয়! তারপর বেশ চলছিল গল্পটা বাড়ি আর বনজঙ্গল নিয়ে, দিব্যি একটা পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বোমা ফেলে আকস্মিক সব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে, মায়াজালটিকে কুটিকুটি ছিঁড়ে না ফেলে ছাড়লে না!

সব মেনে নিলেও বইটা পড়ে প্রাণটা কেমন করে, বৃষ্টির ছাঁটগুলো গায়ে এসে বেঁধে, ভালুক ছানার কি হল ভেবে ঘুম হয় না, মুখে পাকা চেরির স্বাদ লাগে, ভালুকের জিভের চাটন লেগে প্রাণ জুড়োয়। এই রকম মন থেকে মনে যে বই কথা কয়, যার লিখিত অংশের চাইতেও অলিখিত অংশগুলি বেশী বাঙময়, তাকেই আমি সাহিত্য বলি, শুধু নিখুঁৎ কারিগরিকে নয়।

আরেকখানি এমনি ধারা বই পড়লাম। শিবশঙ্কর মিত্রের "সুন্দর বনের অর্জুন সর্দার"। তাকে ছোটদের বইও বলা যায়, বড়দের বইও বলা যায়, ভাষার হাজার ত্রুটি, মাঝে মাঝে খটমট করে কানে, কিন্তু এমনি মর্মস্পর্শী কাহিনী যে পড়তে পড়তে মনে হয় এর কাছে ভাষাটাষা কিছু নয়, তার চাইতেও অনেক বেশী প্রবল একটা স্রোতে যেন ভেসে গেলাম। রচনার মধ্যে এমনি প্রবল প্রাণের স্পন্দন না থাকলে সে সাহিত্য হয়ে ওঠে না।

আর শিশুসাহিত্য তার চেয়েও প্রবল হবে। এমন হবে যে তার আবেদনে সমস্ত হৃদয় মন সাড়া দেবে, চিত্তের প্রতিটি অনুভূতি প্রাণময় হয়ে উঠবে। মনের শতদল বিকশিত হয়ে উঠবে। তবে সে না শিশুসাহিত্য।

লীলা মজুমদার

ববির বন্ধু—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিগনেট প্রেস। কলিকাতা। মূল্য ২·৫০ ন. প.

সুন্দর বনের অর্জুন সর্দার—শিবশঙ্কর মিত্র। দীপায়ন পাবলিশার্স। কলিকাতা। মূল্য ৩·২৫ ন.প.

স মা লো চ না

কালিদাসের মেঘদূত—বুদ্ধদেব বসু অনূদিত। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ১২। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ-সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় যে মহাকবি কালিদাসের অমরলেখনী-প্রসূত "মেঘদূত" খণ্ডকাব্যের বঙ্গানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা অপরিসীম সুখের বিষয়। বসু মহাশয় অনুবাদের পূর্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনীষা ও বৈশ্লেষণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে এবং আমরাও তাঁহার উদগ্র শেমুষীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। অনুবাদের বৈচিত্র্য এই যে, মূলের মন্দাক্রান্তা ছন্দের গতিকে তিনি অনুবাদের মাধ্যমে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহাতেও তাঁহার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার বৈশিষ্ট্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে তিনি যে টীকা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণের অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানপিপাসু পাঠকের প্রভূত আনুকূল্য সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

অনুবাদের উপক্রমণিকায় বসু মহাশয় 'সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য' আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সংস্কৃত সাহিত্যে সমার্থক 'শব্দগুলোর মূল অর্থ উপেক্ষা ক'রে কবিরা তাদের নির্বিশেষ ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন, নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে' (পৃঃ ৮)। সংস্কৃতে পর্যায় শব্দের প্রাচুর্য আছে একথা সত্য, কিন্তু সর্বত্রই যে পর্যায় শব্দগুলি একই অর্থকে প্রকাশ করে একথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি সমার্থক শব্দ তাহারা যে বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করে, ইহা সংস্কৃত টীকাকারগণ বহুস্থলে দেখাইয়াছেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের প্রথম অঙ্কে পুনরুক্তিনিবারণকল্পে রশ্মি, প্রগ্রহ এবং অভীষু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু সর্বত্রই যে পুনরুক্তিভয়ে পর্যায় শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। "রঘুবংশের" দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত আছে—স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিপার্শ্বে অবস্থিত দেবগাভী সুরভিকে লক্ষ্য না করিয়া মহারাজ দিলীপ সত্বরে চলিয়া আসেন। মহদতিক্রমজনিত অপরাধের জন্য মহারাজ দিলীপ ও মহিষী সুদক্ষিণা অভিশপ্ত হইলেন। ফলে রাজদম্পতী বহুকাল অপুত্রক রহিলেন। পুত্রলাভের আশায় মহারাজ ও মহিষী আচার্য বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। আচার্যের উপদেশক্রমে সুরভিকন্যা নন্দিনীকে সেবাগুণে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ পুত্রলাভ করিলেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকে যে 'জায়া' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বিবরণপ্রসঙ্গে টীকাকার বলিয়াছেন যে 'জায়া' পদের প্রয়োগ ইহাই নির্দেশ করিতেছে যে পুত্রজননে সুদক্ষিণার সামর্থ্য ছিল কিন্তু আকস্মিক কারণে সে সামর্থ্য প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। এই পদটির প্রয়োগের দ্বারাই সমগ্রসর্গপ্রতিপাদ্য ভাবী অর্থের সূচনা করা হইয়াছে। সুতরাং সর্বত্র যে পর্যায় শব্দ সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়া

থাকে এরূপ সিদ্ধান্তের মূলে বিশেষ যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" যুগ যুগ ধরিয়া সহৃদয় চিত্তকে আবর্জিত করিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, এই খণ্ড কাব্যখানি কবির পরিণত বয়সের রচনা। প্রসিদ্ধি আছে, "রঘুবংশ" রচনার পর কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রামায়ণী কথা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিলে আদি কবির ছায়াতেই তাঁহাকে থাকিতে হইবে, তাঁহার কবি-প্রতিভার মৌলিক গৌরব হয়তো বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃত হইবে না। তাই রামায়ণী কথা অবলম্বনে কবি কোন নাটক রচনা করেন নাই। কিন্তু "শকুন্তলা" নাটক পড়িলেই ইহা স্বভাবত মনে হয় যে এই নাটকের নায়িকা জনকতনয়ার ন্যায়ই মহিয়সী রমণী। পঞ্চম অঙ্কে আমরা দেখি যে, যখন দৈব-বিড়ম্বিত হইয়া শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, হেমন্তের জীর্ণপত্রের ন্যায় তাঁহার দুরারোহিণী আশা চিরতরে ঝরিয়া পড়িল তখনই তিনি একবার রোষে মহারাজ দুষ্মন্তকে ধিক্কার দিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তম অঙ্কে আবার আমরা যখন তাঁহাকে দেখি তখন প্রোষিতভর্তৃকার শান্ত স্নিগ্ধ সংযতমূর্তি মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য তপোবনে চিরনির্বাসিতা জনকনন্দিনীর কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সমগ্র নাটকটি আলোচনা করিলে একথা মনে হয় না যে, নায়িকার জন্মরহস্য কোনও এক অসংযমের মধ্যে নিহিত আছে। মহাকবি কালিদাস এরূপভাবে ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহাতে স্বর্গ ও মর্ত্যের, কাম ও প্রেমের যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা সহৃদয় সমাজে সর্বতোভাবে স্বীকৃত। হয়তো এই প্রসিদ্ধিরই প্রতিধ্বনি করিয়া টীকাকারগণ "মেঘদূতে"র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন রামগিরি-প্রবাসী এই যক্ষ শ্রীরামচন্দ্র, মেঘরূপী দূত পবন-নন্দন এবং অলকায় যে যক্ষবধূ বিরহাতুরা তিনি স্বয়ং রাঘববাঞ্ছা। কাম যদি প্রেমে পর্যবসিত না হয় তাহা হইলে সেই কাম আদরণীয় হইতে পারে না—এ কথা সুদূর অতীত হইতে আজ পর্যন্ত বিদগ্ধসমাজে সুপরিচিত। এই কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করিতে হইলে দেহধ্বংসের অপেক্ষা থাকে না। এই শরীরেই কামভূমিকে অতিক্রম করিয়া প্রেমভূমিতে আরোহণ করা যায়। "মেঘদূত" কাব্যেও এই সত্যই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাই বিরহাতুর যক্ষ সম্পূর্ণরূপে কাম-গন্ধহীন একথা প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়াস নিরর্থক। "শকুন্তলা" নাটকের প্রথম হইতে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা তো ভোগভূমির বিষয়, ত্যাগভূমির নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সপ্তম অঙ্কে যে মিলন তাহাও কি রূপজ মোহের বার্তাই বহন করিয়া আনে? মেঘ যখন অলকায় প্রবেশ করিবে তখন সে যাহা যাহা দেখিবে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে যক্ষ যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে 'ভূদৃশ্যের' আর 'ভূস্বর্গের চিত্ররচনা'-ই প্রধান এবং ভোগ্যবস্তু ও ভোগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু যে প্রেম দেহধর্মী নহে, যে প্রেম দৈহিক ভোগের অভাবেও উহার শাশ্বত বর্তিকাকে অনির্বাণ করিয়া রাখে, সেই শাশ্বত শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে কিন্তু যক্ষ সচেতন। উচ্ছৃঙ্খল ভোগের মুহূর্তে যে শাপ তাহাকে বৎসরাবধি বিরহতাপ সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল সেই ভোগ কিন্তু তাহাকে এই শিক্ষাই দিয়াছে এবং এই আশাতেই সে তাহার জীবন রাখিয়াছে যে, চরম প্রেম অচঞ্চল এবং একনিষ্ঠ। তাই সমস্ত ভোগের মধ্যে এ কথাই সে শেষ পর্যন্ত ভাবিয়াছে যে, তাহার প্রিয়া জনকতনয়ার ন্যায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। বিরহে সে প্রেম ম্লান হয় না, লাঞ্ছনায় সে প্রেম বিপর্যয় প্রাপ্ত হয় না, প্রতিকূল দৈব সে প্রেমের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। যক্ষ এই প্রেমেরই উপাসক। তাই 'যক্ষের কাছে...নারী ভোগ্য সামগ্রী মাত্র ইন্দ্রিয়বিলাসের প্রধান উপাদান।' "মেঘদূত" সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর এই মৌলিক চিন্তা-

ধারাকে বুদ্ধিস্থ করিতে পারিলেও সমর্থন করিতে পারা যায় বলিয়া মনে হয় না।

সমীক্ষা করিতে হইলে অনেক কথাই লিখিতে হয়। তাই আমরা অল্প কয়েকটি কথারই উল্লেখ করিলাম। শব্দধ্বনি বা মন্দাক্রান্তা ছন্দের বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে "মেঘদূতে"র গৌরব বহন করিতেছে এ কথা সত্য হইলেও এতদ্ব্যতীত মেঘদূতের উৎকর্ষসাধক অন্য চিহ্নের প্রতি সামাজিক রসিকচিত্ত আকৃষ্ট হয় কি না ইহাও ভাবিবার কথা। অর্থধ্বনি এবং ধ্বনিত অর্থের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য না থাকিলে কাব্যের স্বরূপহানি হয় একথা আলংকারিক সমাজের অপরিচিত নয়।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী

চিঠিপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। কলিকাতা, ৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ পত্রাকারে যা লিখতেন তা আসলে প্রবন্ধ, ঘরোয়া চিঠি লেখা তাঁর স্বভাবের বাইরে ছিল—এ ধারণা পাঁচ খণ্ড চিঠিপত্র প্রকাশের পর নিশ্চয়ই দূর হয়েছে। সেই পাঁচ খণ্ডে সংকলিত চিঠিগুলি ছিল তাঁরই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা এবং তা থেকে সংসারের বিবিধ কর্তব্যে জড়িত স্বামী, পিতা, স্বজনবৎসল, স্নেহ-ভালোবাসা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরা যে মানুষটিকে আমরা আবিষ্কার করি তাঁর সঙ্গে তেমন নিবিড় পরিচয় ইতিপূর্বে আমাদের ছিল না। এই পরিচয় সত্ত্বেও কল্পনা করা কঠিন যে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও সত্যিকারের বন্ধুত্ব ঘটাবার মতো অবকাশ হয়েছিল এবং হৃদয়ের উত্তাপে ভরা মানবিক বন্ধুতার চিঠি কাউকে কাউকে তিনি লিখেছিলেন, সাহিত্যিক গুণপনা সত্ত্বেও যে সব চিঠি প্রবন্ধ নয়, চিঠি। আলোচ্য ৬ষ্ঠ খণ্ড "চিঠিপত্রে" সংকলিত এই ধরনের ৩৬ খানি চিঠি রবীন্দ্র-নাথের জীবনের সেই স্বল্পপরিজ্ঞাত অধ্যায়কে আমাদের কাছে উন্মোচিত করে।

এই চিঠিগুলি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে বর্তমান শতাব্দী শুরু হওয়ার অল্প আগে থেকে প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে লেখা। প্রথম চিঠির তারিখ ১৮৯৯, দুজনেই যখন চল্লিশের এদিকে ওদিকে। গ্রন্থভুক্ত শেষ চিঠি লিখেছিলেন ১৯২৮ সালে, যার ন বছর পরে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়, যে শোকের উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> 'তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময় আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন ক'রে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবলকণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছুদিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিম পথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ ক'রে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না।'...('জগদীশচন্দ্র')

সে অবকাশ সত্যি দীর্ঘ হ'তে পারেওনি। এর পরে রবীন্দ্রনাথ চার বৎসর মাত্র জীবিত

ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের বন্ধু বলতে কজনেরই বা নাম করা যায়? রটেনস্টাইন? ইয়েট্‌স্? এন্‌ড্রুজ? এঁদের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতাকে বন্ধুত্বের প্রণয় বলা যায় কিনা জানি না। জগদীশচন্দ্রই হয়তো তাঁর জীবনে একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন :

'তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই, কিন্তু কতদিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে।...পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষপুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।' (পত্র ১৯)

উত্তরে প্রবাসী জগদীশচন্দ্রের চিঠি গ্রন্থপরিচিতি থেকে তুলে দিই :

['সেদিন তোমার কবিতাগুলি পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তর, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?']

'প্রবাসী'তে জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী প্রকাশের সময়েও ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন।...আমার বন্ধুর মধ্যে আমি আলো দেখেছিলুম।...'

এ শুধু ভাবের কথা নয়। জগদীশচন্দ্রই বোধ করি প্রথম তাঁর ছোটো গল্পের অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই উৎসাহেই হয়তো বা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতারও ইংরেজি অনুবাদ করে থাকবেন, যার মধ্য দিয়ে ভারতীয় কবির বাণী বিশ্বের কানে পৌঁছেছিল।

আসলে বিজ্ঞানী হলেও জগদীশচন্দ্রের প্রবৃত্তি ছিল সাহিত্যিকের। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে আরো একটি গভীর বন্ধন ছিল, সে হচ্ছে তাঁদের দেশপ্রীতি, যাকে যথার্থ দেশপ্রীতি বলে চিনতে পারার মতো লোক সে যুগে ছিল না বললেই চলে। ইতিহাসের পরম এক সন্ধিক্ষণে দুয়ের মিলন হয়েছিল, যুগের সঞ্চিত গ্লানি আর পরাভবকে যখন প্রকৃত আত্মশক্তির বলে দূর করবার কথা কারো কারো মনে সদ্য দেখা দিয়েছে। সে সময় বাংলাদেশের দুটিমাত্র মানুষের মধ্যেই বোধ করি এই কর্মের উপযুক্ত শক্তি এবং প্রতিভা ছিল। তাঁদের একজন কবি, অন্য জন বিজ্ঞানী। তখনো রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা দিয়ে বলদৃপ্ত ইউরোপের চিত্তকে আলোড়িত করার কথা চিন্তা করছেন না; ভাবছেন, ইউরোপ যখন জ্ঞানের সাধনায় শক্তিলাভ করেছে, অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের নবজাগ্রত আত্মাকে স্বরাজ পেতে হবে। তাই জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর চাঞ্চল্যকারী আবিষ্কারের তত্ত্বকে বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করছেন, রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুলভাবে তাঁকে লিখছেন :

'তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি—আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই—আর একবার আমাদিগকে গুরুর

বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে—নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।...'
(পত্র ২০)

দুজনেরই হৃদয়ে পুনরায় ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং প্রেরণা, দুজনেই প্রবল প্রতিভার অধিকারী; একজন সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে সমাদৃত হতে চলেছেন, আর একজনের কবিতার স্বরও বাংলাদেশের নিভৃত নির্জন থেকে প্রবাহিত হয়ে শীঘ্রই বিশ্বের প্রাণে পৌঁছবে। এমন সময়, এমন দুটি মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, সে ইতিহাস সগর্বে স্মরণযোগ্য। এই সব চিঠির মধ্যে সে কাহিনীর অনেকটা অংশ লেখা আছে।

এই সব চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নবীন ভারতের গৌরবস্বপ্নে মশগুল হ'য়ে বন্ধুকে উৎসাহিত করেছেন তা নয়, জগদীশচন্দ্র যাতে স্বাধীনভাবে, সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কর্মে লিপ্ত থাকতে পারেন, সেজন্য কলকাতা থেকে ত্রিপুরার মহারাজের নিকট ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। মহারাজকে তার আগেই লিখেছেন :

[(জগদীশচন্দ্রের) বিজ্ঞানালোচনায় সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে-উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি—আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দূরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না।...জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক—এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত।...আমি মহারাজের নির্জন খাস দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী—'(১৩৪ পৃঃ)]

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সেই-অর্থ সেদিন যদি বিদেশে জগদীশচন্দ্রের নিকট না পৌঁছত তবে তাঁর আরব্ধ কর্মের সমাধা হোত কিনা সন্দেহ। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর 'বঙ্গদর্শন' এবং পরে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় স্বয়ং জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের স্বরূপ আলোচনা ক'রে বারংবার প্রবন্ধ লিখছেন, কবিতা লিখছেন, এমনকি বন্ধুর বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সম্পাদনা করার কথাও এক সময়ে ভেবে থাকবেন। বোমাবারুদবক্তৃতা দিয়ে সেদিন যারা ইংরেজ তাড়াচ্ছিলেন, এবং রাজনীতির মঞ্চ অধিকারের কুস্তি লড়ছিলেন তাদের সংসর্গ ছেড়ে, একাকী রবীন্দ্রনাথ এই যে সাধনায় নিজেকে সেদিন উৎসর্গ করেছিলেন—তার মূল্য সাময়িক কোনো উত্তেজনার গজফিতে দিয়ে মাপা যায় না। দেশবাসী সেদিনও সে কাজের মর্যাদা বুঝতে পারেন নি। এখনো সম্পূর্ণ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তার ফলে দুবন্ধুই মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন যে বাধা শুধু উদ্ধত ইংরেজের দিক থেকে নয়; স্বদেশের মূঢ়তা এবং উদাসীনতাও পর্বতপ্রমাণ। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থপরিচয় থেকে জগদীশচন্দ্রের পত্রাংশ উদ্ধার করি। এ চিঠি ১৯২৮ সালে লেখা :

'আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কাজ হইয়াছে এবং হইবে। এই কথা সর্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের

একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।...' (২৪০ পৃঃ)

এই সর্বনাশা নপুংসক পরিবেশের মধ্যেই দুইবন্ধু আপন আপন জীবনের চরিতার্থতাকে জিততে পেরেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের গবেষণা এবং আবিষ্কার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন যে অতদূর উন্মাদনা বোধ করেছিলেন সেকথাও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এই আবিষ্কার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভিতকে ধ্বসিয়ে দিয়ে, রসায়ন পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখা, জীব ও অজীবের মধ্যেকার ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মহৎ ঐক্যের পরীক্ষিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। উপনিষদ যাঁর জীবনের মূলপ্রেরণা সেই কবির পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রশালায় ভারতের প্রাচীন ঋষির উপলব্ধি—এই মৌল ঐক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভাবনা যে কতবড় উত্তেজনাকর মনে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে "কাহিনী" "ক্ষণিকা" পেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ তখন "নৈবেদ্যে"র কবিতাগুলিকে একে একে তাঁর 'জীবনের সমস্ত কৃত কর্মে'র সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখসুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগন্মণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল' সেই তাঁর অন্তর্যামীকে নিবেদন করছেন।

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার তাঁকে এই অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল শুনতে সহায়তা করেছিল বললে বোধ করি খুব বাড়িয়ে বলা হবে না।

আগামী বৎসর জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী। এই গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী এ উপলক্ষ্যে আমাদের যা কৃত্য তার সূচনা করে দিলেন। আশা করি শীঘ্রই জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীও প্রকাশিত হবে, এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রকাশেও বিলম্ব হবে না। এই শেষোক্ত কাজটি নিতান্তই প্রয়োজন। তার কারণ বঙ্গলোকে যে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, তরঙ্গরেখায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া, এবং তড়িতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণের কৌশল আবিষ্কার করা ছাড়াও জগদীশচন্দ্র আর কী মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন সে বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে তাঁর গবেষণা পশ্চিমী জড়বিজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু এ হেন যুগান্তকারী গবেষণা শেষপর্যন্ত সফল হয়েছিল কিনা তা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানীদের মুখ থেকেই জানতে চাই। জড় এবং জীবের বৈষম্য এখনও কি অলঙ্ঘ্য নয়? অন্যপক্ষে যারা বলেন বিজ্ঞানের এলাকায় এসেও জগদীশচন্দ্রের সাধনা আরোহী যুক্তির চেয়েও অবরোহী যুক্তিরই অধিক অনুগামী, তাদের প্রশ্নেরও নিরসন করা আবশ্যক।

গ্রন্থসংকলক পুলিনবিহারী সেন মহাশয় তাঁর সম্পাদনানৈপুণ্যে উত্তরোত্তর আমাদের

বিস্মিত করে দিচ্ছেন। ২৬২ পৃষ্ঠার এই বইতে ১০০ পৃষ্ঠারও কম জায়গা জুড়ে আছে মূল চিঠিপত্র। বাকি অংশ পরিশিষ্টের অন্তর্গত। তাতে আছে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রাসঙ্গিক কবিতা, প্রবন্ধ, অন্যদের কাছে এই উপলক্ষ্যে লেখা তাঁর চিঠি এবং প্রায় একশো পৃষ্ঠা ধ'রে গ্রন্থপরিচয়। বাংলা গ্রন্থসম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ স্থাপন করলেন। তিরিশ বছর ধ'রে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই ৩৬ খানি চিঠিতে হেন প্রসঙ্গ নেই যে বিষয়ে পাঠকের জ্ঞাতব্য তথ্যাদি তিনি না দিয়েছেন। 'আপনি ক বিন্দুতে কম্পমান, আমি খ বিন্দুতে দিব্য নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি' কিংবা 'পৃথিবীকে সর্বত্র চিমটি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব অনুভব করা গেল'—গ্রন্থপরিচয়ের সহায়তা ভিন্ন এসব মন্তব্যের অর্থোদ্ধার করাই অসম্ভব। তাছাড়া, এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক ভ্রমণের সঙ্গাদানের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, এই সামান্য সূত্র ধ'রে সম্পাদক মহাশয় যেসব তথ্যাদি একত্রিত করেছেন তা বাস্তবিক অপ্রত্যাশিত। তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর চার বছর পরে দুই বন্ধু একত্রে বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে জনৈক জাপানী বৌদ্ধের যে স্তব শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন, পরবর্তীকালে "নটীর পূজায়" শ্রীমতীর মুখে সেই স্তবটিকেই বসানো হয়েছে। বিচিত্র সূত্র থেকে সংকলিত এই সব তথ্যের যোগে বিচ্ছিন্ন পত্রগুলিকে অবলম্বন করেই কবি এবং বিজ্ঞানী বন্ধুযুগলের একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক কাহিনী আমরা অনুসরণ করতে পারি। সম্পাদনা কর্মে এতটা যোগ্যতা, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার পরিচয় এদেশে তো নয়ই, বিদেশীদের মধ্যেও সহসা চোখে পড়ে না। একটু অসুবিধা হল, এই সঙ্গে জগদীশচন্দ্র এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও জীবনের দুটি ঘটনাপঞ্জী দেওয়া হয় নি ব'লে। তা থাকলেই গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হোত। আর একমাত্র আপত্তি গ্রন্থপরিচয়ের ভাষা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সে সাধুভাষার যে নকলদুর্গ ত্যাগ করে এসেছিলেন, সম্পাদক এতকাল পরে তারই এক গবাক্ষ থেকে কথা বলছেন দেখে আমাদের স্বতঃই অপ্রস্তুত লাগে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রক্ষা এবং প্রচার করাই যদি বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের কর্ম হ'য়ে থাকে তাহলে প্রকাশিত গ্রন্থাদিতেও ভাষা ব্যবহারে তাঁকেই অনুসরণ করা হবে বলে আমরা আশা রাখব।

নরেশ গুহ

Secrets of Suez. *By* Merry and Serge Bromberger. Sidgwick and Jackson. London. 2*s.* 6*d.*
100 Hours to Suez. *By* Robert Henriques. Viking Press. New York. $3.00

ক্লিওপেট্রার নাক আর একটুখানি লম্বা হ'লে প্রাচীন রোমের ইতিহাস অন্যরকম হত, পণ্ডিতমহলে এমন একটি প্রবাদ অনেকদিন ধরে চলতি আছে। স্যার অ্যান্থনী ইডেনের পিতৃনালীর সঙ্গে সুয়েজে ইঙ্গ-ফরাসী ভাগ্য-বিপর্যয়ের এরকম কোন কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে কিনা বলা শক্ত। তবে সুয়েজ-যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা শক্ত। এ যুদ্ধের গোড়াতেও জিজ্ঞাসা, শেষেও জিজ্ঞাসা। সুয়েজ-যুদ্ধ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে; যা লেখা

হয়নি, হয়তো কোনদিনই লেখা হবে না, তার পরিমাণ এবং গুরুত্ব কম নয়। অর্থাৎ সুয়েজ অভিযান সম্পর্কে স্যার অ্যান্থনী ইডেন, গ্যাঁ মোলে এবং বেন গুরিয়ন যদি তাঁদের গোপন সলা-পরামর্শ, সিদ্ধান্ত এবং কার্যাবলীর বক্তব্যত প্রকাশ করতেন, তাহ'লে হয়তো কতকগুলি রহস্যময় সূত্রের সন্ধান পাওয়া সহজ হত। একই ঘটনাবলী অবশ্য নানা দিক থেকে নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তা করা হয়েছেও। সুয়েজ-যুদ্ধের ব্যর্থতার জন্য ফরাসীরা দোষ দিয়েছে ইংরেজদের উপর, ইংরেজরা চটেছে মিঃ ডালেসের উপর। ওরই মধ্যে টোরী গভর্নমেণ্টের উগ্র সমর্থক যারা তাদের রাগ আবার লেবার পার্টির বিভাগগেইটস্কেলের উপর। সাম্প্রতিক কালের সংক্ষিপ্ততম যুদ্ধ হল সুয়েজ নিয়ে—যুদ্ধও ঠিক নয়, একতরফা হামলা সুয়েজ খাল এলাকায় শান্তিরক্ষার অজুহাতে। প্রখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক জেমস ক্যামেরন বলছেন, সুয়েজ অভিযান সমসাময়িক ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয়, সবচেয়ে কলঙ্কময় একটি অধ্যায়। ফরাসী সাংবাদিক ভ্রাতৃত্বময় মেরী ও সার্জ ব্রমবের্গার অবশ্য ক্যামেরনের মতো বিবেক পীড়িত নন। এঁদের মতে মিশর এবং প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে শায়েস্তা করার জন্য সুয়েজ অভিযানের পরিকল্পনাটি ভালোই করা হয়েছিল। এঁদের আক্ষেপ এবং অভিযোগ হল, শেষরক্ষা করা যায়নি স্যার এ্যান্থনী ইডেনের দুর্বলচিত্ততার জন্য। ব্রমবের্গার ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী হল অনেকটা ফরাসী সামরিক কর্তাদের অনুগামী। এঁদের অভিযোগ, সামরিক দিক থেকে সুয়েজ দখলের অভিযান সফল হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হল প্রধানত ইডেনের জন্য। এটা অবশ্য গোঁড়া ফরাসী ভাষ্য; ব্রমবের্গার ভ্রাতারা এর সপক্ষে অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা (এবং রটনাও) চমকপ্রদভাবে সাজিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সুয়েজ অভিযানের উদ্দেশ্য ভালোই (!) ছিল, কিন্তু এর পরিচালনায় লজ্জাকর অনিশ্চয়তার ফলে শেষ মুহূর্তে ইংগ-ফরাসী অভিযাত্রী বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া হয়। ব্রমবের্গার ভ্রাতাদের জঙ্গী মনোভাব আমাদের কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। তবে তাঁদের বর্ণিত কাহিনী কতকগুলি রহস্যজনক বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট আলোক-সম্পাত করেছে। মিশর আক্রমণের জন্য পর্দার আড়ালে যে চক্রান্ত ও প্রস্তুতি চলেছিল ব্রমবের্গার ভ্রাতারা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। ২২শে অক্টোবর (১৯৫৬) গ্যাঁ মোলে এবং বেন গুরিয়ন গোপন সলা-পরামর্শ করেন। ২৯শে অক্টোবর ইসরেলী সৈন্য মিশরের সিনাই অঞ্চলে আক্রমণ সুরু করে। ৩০শে অক্টোবর ইংগ-ফরাসী পক্ষ চরমপত্র ঘোষণা করে। ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ বিমান থেকে বোমা ফেলা হয় মিশরের বিমানক্ষেত্রে। পরের দিন ব্রিটিশ ও ফরাসী বিমানবহর একযোগে আক্রমণ চালায়। ইডেনের ভরসা ছিল কেবল বিমান-আক্রমণ চালিয়ে ২।৩ দিনের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে নতুবা অন্ততপক্ষে ইংগ-ফরাসী দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে। ২রা নভেম্বর ইসরেলী সৈন্যরা সুয়েজ খালের দশ মাইল কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছেও গিয়েছিল। ইসরেলের সঙ্গে প্রকাশ্য সহযোগিতা করতে ইডেন নারাজ, কারণ তাহ'লে মধ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ-আরব সম্পর্কের ভিত একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। ফরাসী তরফ থেকে গ্যাঁ মোলে ইসরেলের উপরে ভর ক'রে আলজেরিয়া এবং সুয়েজের জন্য মিশরকে ঘায়েল করতে অগ্রণী হলেন। ইসরেলের যুদ্ধ-ঘাঁটি থেকেই ব্রিটিশ বিমানবহর মিশরে আক্রমণ সুরু করে। এত তোড়জোড় সত্ত্বেও সুয়েজ অভিযান তবে বানচাল হল কেন? এই প্রশ্নের এক কথায় কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ব্রমবের্গার ভ্রাতারাও তা দিতে পারেননি। ইডেন আশা করেছিলেন সুয়েজ অভিযান সুরু হ'য়ে গেলে পর আমেরিকা বাধা দেবে না বরঞ্চ ইংগ-ফরাসী পক্ষকে সমর্থন

করবে। তা হয়নি। ইডেন আরো আশা করেছিলেন যে মিশরের উপরে বিমান-আক্রমণের ফলে কাইরোতে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটবে এবং নাসেরের পতন হবে। তাও হয়নি। সরাসরি সুয়েজ খাল দখল করার প্রস্তাব করেছিলেন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী গ্যাঁ মোলে এবং ইসরেলী প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়ন। ইডেন অতদূর পর্যন্ত যেতে ভরসা পাননি। ফলে সুয়েজ অভিযানটি সামরিক দিক দিয়ে প্রায় হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ৪ঠা নভেম্বর বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ সুয়েজ এলাকায় অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি দাবি করে প্রস্তাব পাশ করে। ৫-৬ নভেম্বর ব্রিটিশ-ফরাসী সৈন্যবাহিনী পোর্ট সৈয়দে পৌঁছায়। প্রায় ৪০ ঘণ্টাকাল মিশরের মাটি ইংগ-ফরাসী আক্রমণকারী সৈন্যদের দখলে ছিল। সুয়েজ খালে ইসরেলী সৈন্যদের পৌঁছুতে বাকি ছিল ১০০ ঘণ্টার পথ। ৬ই নভেম্বর সকাল ৭টার সময় ইংগ-ফরাসী নৌবহর সুয়েজ খালে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ঐ দিনই রাত ১১-৫৫ মিনিটের সময় ইংগ-ফরাসী পক্ষ যুদ্ধ-বিরতির আদেশ ঘোষণা করে। ব্রমবের্গার ভ্রাতাদের মতে ইডেন-ই যুদ্ধ থামানোর জন্য তাড়াহুড়া করেন। গ্যাঁ মোলের মতলব ছিল যুদ্ধ-বিরতির সময়টা পেছিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে সুয়েজ খাল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দখল প্রতিষ্ঠা করা। ইংগ-ফরাসী পক্ষের Operation Musketeer-এর পরিকল্পনায় সামরিক ত্রুটি তত ছিল না যতটা ছিল এবং পরে মর্মান্তিকভাবে দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক ত্রুটি। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন মিলিতভাবে ইংগ-ফরাসী পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এটা লণ্ডন, প্যারিসের যুদ্ধনেতারা হিসাবে নেওয়া দূরের কথা, কল্পনাই করতে পারেননি। সুয়েজ অভিযানের রাজনৈতিক বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে ব্রমবের্গার ভ্রাতারা অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করেছেন। মিঃ ডালেস কেন চরম সংকটের সময় ইংগ-ফরাসী বন্ধুদের সাহায্যে অগ্রসর হ'তে নারাজ হলেন? আমেরিকান তৈল-ব্যবসায়ীরা আরবদের অসন্তুষ্ট করতে চায়নি, এটা একটা কারণ হলেও বোধ হয় এ-দিয়ে সুয়েজ ব্যাপারে মার্কিন নীতি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে মিঃ ডালেস গোড়া থেকেই মিশরের বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। আগাষ্ট-অক্টোবর (১৯৫৬) সালে ইংগ-ফরাসী যুদ্ধ-বিশারদরা গোপনে গোপনে মিশরের বিরুদ্ধে যে সব আয়োজন করছিলেন সে খবর মিঃ ডালেসের অজ্ঞাত ছিল না। তা ছাড়া এই সময়টায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মিঃ আইসেনহাওয়ার জীবনের সায়াহ্নে যুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ের প্রতি বিরোধী হয়েছেন এটিও একটি কারণ ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে। সেইরকম ব্যক্তিগত কারণ একটি হয়তো স্যার এ্যান্থনী ইডেনের পিত্তনালী, যা কয়েক বৎসর আগে আমেরিকান অস্ত্র-চিকিৎসকেরা ছেঁটে ফেলে বদলে একটি প্ল্যাস্টিকের নল লাগিয়ে দেন। ব্রমবের্গার ভ্রাতাদের ধারণা হল, ইডেন শেষরক্ষা করতে পারেননি, সুয়েজ দখল যখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তখন যে তিনি পিছু হটেছেন, তার কারণ হল শিথিল, দুশ্চিন্ততায় (মন্ত্রিসভায় মিঃ বাটলারের বিরোধিতা, বাইরে লেবার পার্টির নেতৃত্বে জনবিক্ষোভ, কমনওয়েলথে তীব্র মতপার্থক্য, মিঃ আইসেনহাওয়ারের রোষ, মিঃ বুলগানিনের রকেট-রোমা-স্মারক)। ইডেনের প্ল্যাস্টিক পিত্তনালী বিকল হয়েছিল। এ-রকম অনুমান প্রমাণ নয় এবং এ-রকম অনুমান 'সিক্রেটস অফ সুয়েজ'-এর পর্যায়ে পড়ে না। ব্রমবের্গার ভ্রাতারা সুয়েজ যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী করেছেন স্যার আন্থনী ইডেন ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে। এঁরা অনেকটা সরকারী ফরাসী মত পরিবেশন করেছেন। সুয়েজ যুদ্ধ যে পর্বতপ্রমাণ শঠতা এবং মূঢ়তার ঐতিহাসিক প্রমাণ সৃষ্টি করেছে সে কথা এই দুই অতি-উৎসাহী ফরাসী সাংবাদিক ভ্রাতা

কোথায়ও স্বীকার করেননি। এঁদের আক্ষেপ হল মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাব ফিরিয়ে আনার একটা চমৎকার সুযোগ নষ্ট হয়েছে।

'হাণ্ড্রেড আওয়ার্স টু সুয়েজ'-এর লেখক কর্নেল রবার্ট হেনরিক ব্রমবেগারিদের চাইতে আরো বেশি যুদ্ধোৎসাহী। সুয়েজ যুদ্ধে ইসরেলের সামরিক অভিযান ইনি বেশ ঝরঝরে হালকা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তবে এই ব্রিটিশ ইহুদী লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্টতরই হল ইসরেলী সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সাদা এবং কালো—একদিকে সাহসী এবং রণকুশল ইসরেলী সৈন্য, অন্যদিকে ভীরু অপদার্থ মিশরী সৈন্য। কর্নেল হেনরিক কতকটা কর্নেল ব্লিম্পের মতোই ক্ষীণদৃষ্টি, স্থূলবুদ্ধি। অভ্যস্ত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নিয়ে তিনি আগেই সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছেন যে আরবেরা অকর্মণ্য। অতর্কিতভাবে মিশর আক্রমণ করাটা তাঁর কাছে মোটেই আপত্তিকর নয়। ইসরেলের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষের যোগসাজস, ফরাসী বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ইসরেলী সৈন্যের অগ্রগতি—এ-সব প্রমাণিত সত্য হেনরিক বেমালুম অস্বীকার করেছেন। হেনরিকের বিবরণী ইসরেলী গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরেলীদের অনুকূলে লেখা।

সরোজ আচার্য

বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুৎ গোস্বামী। নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা, ২০। মূল্য ছয় টাকা।

দুঃখের হলেও একথা অনস্বীকার্য, ভাল উপন্যাস অধুনা বিরল দর্শন। যদিও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সম্পদ অপ্রচুর, তবু যে-ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অধিকারী, সে-ক্ষেত্রে আমাদের ঘরে অন্তত কিছু ফসল জমা হওয়ার কথা। কিন্তু সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলি সে আশা সুদূরবর্তী করেছে।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক বর্তমান। এবং সেই সম্পর্ক অন্বেষণ, যদিও দুরূহ, সাধুবাদের যোগ্য। অচ্যুৎ গোস্বামী সেই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন।

তিনি তাঁর আলোচনাকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন, এবং সেই আলোচনার সূত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়কার সমাজ বিন্যাস থেকে। আর শেষ আধুনিক বাংলা সমাজ ও বাংলা উপন্যাসের পর্যালোচনায়। ফলে, প্রাক-বঙ্কিম যুগ থেকে অধুনা, বিভিন্ন সময়ের উপন্যাসের একটি চরিত্রগত বৈসাদৃশ্য আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম। লেখক পূর্বাপর ইতিহাসের সঙ্গে আলোচ্য কোনও ঔপন্যাসিক-কে যুক্ত করতে সচেষ্ট। সে-কারণে, অস্পষ্ট হলেও, বাংলা উপন্যাসের গতির একটি আভাস আমরা পাই। অবশ্য লেখক তাঁর ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি লেখককেই যেমন ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেছেন, তেমনি আবার এক বিশিষ্ট অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে সেই লেখকের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

আর এই আভাসের মাধ্যমে একটি সমগ্রের ধারণা আমাদের করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ যে-ক'জন ঔপন্যাসিক সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই

নানা প্রশ্নের অবকাশ রাখেন।

কিন্তু এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা কতটুকু ফলবতী? এই বিচারে লেখককে অনেক বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর অভিধা যেন কেমন অস্পষ্ট। তাঁর মতে "উপন্যাসে বা গল্পে জীবনের একটা ব্যাপক অংশ প্রতিফলিত হয় বলে এগুলি সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পের মত বিশুদ্ধ শিল্প নয়। একমাত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত হয়েই উপন্যাসের সাহিত্য-মূল্য প্রতিভাত হয়।" কিন্তু এই সিদ্ধান্তে তিনি কেমন করে উপনীত হলেন, তা আমাদের অজ্ঞাত। মনে হয় তার এই সংজ্ঞা নিরূপণ যথার্থ নয়। বিশুদ্ধ শিল্প বলতে তিনি কি বুঝেছেন জানি না, তবে কোনো শিল্পই বস্তুত বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ নয়। অবশ্য পরে তিনি আবার এর বিপরীত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। "সাহিত্য আসলে মানুষের অন্তর্জীবন সম্পর্কে লেখকের সমগ্র সত্তা দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে—বুদ্ধির হস্তক্ষেপ ব্যতীত—অনুভূত সত্যের প্রতিফলন।"

একথা ঠিক, উপন্যাস বিচারের কোনো সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা আজো অনুপস্থিত। কিন্তু উপন্যাস চিন্তার দুটি মৌল বিভাগ সম্ভব। একটি ঐতিহাসিক বিচার, অপরটি উপন্যাসের অন্তর্নিহিত চরিত্রের সম্যক অনুধাবন। লেখকের মানসিকতার একটি চিত্র পাবার জন্য এই ইতিহাস অন্বিষ্টা কিছু কার্যকরী। কিন্তু কোনো বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের সমগ্র বিচার যদি সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অবশ্যই প্রমাদের অবকাশ থাকে। উপন্যাস তার নিজস্ব চরিত্রমূল্যেও দাঁড়াতে পারে। এবং তা উপন্যাস বিশেষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই মনে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক, অনুভূত সত্যের প্রতিফলন সত্যিই বুদ্ধির হস্তক্ষেপ ব্যতীত হতে পারে কিনা?

যখন দেখি অচ্যুৎ গোস্বামী বঙ্কিমচন্দ্রকে গণতন্ত্রী লেখক বলে অভিহিত করে সন্তোষ বোধ করেন, তখন স্বতই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে বিচার সম্ভবত উপন্যাসকেন্দ্রিক নয়। "কপালকুণ্ডলা," যেটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, কোনো গণতান্ত্রিক চেতনার পরিবাহক নয়। অথবা তার কোনো কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের নামের পূর্বে এই বিশেষণের প্রয়োগ কেন?

কিম্বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন সভ্যতাবিমুখ বলে তিনি ঘোষণা করেন, তার মধ্যেও যুক্তির অভাব সুস্পষ্ট। "বিভূতিবাবু নিশ্চয়ই কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজ গড়ে তুলবেন। গ্রামগুলো হবে ছোট ছোট, স্বয়ংসম্পূর্ণ, গাছগাছালিতে ভরা। শহর একটিও থাকবে না। না, সব মানুষেরই সমান পরিমাণ জমি থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে জীবন বড় এক ঘেয়ে হয়ে যাবে। ছোট বড় থাকবে, তাহলে মানুষের মধ্যে ছোটো খাটো আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্য চেষ্টা থাকবে," (পৃঃ ১৬) বিভূতিভূষণের জীবন দর্শনের এই পাঠ কি অতি পঠন নয়?

এমন দুটি অচ্যুৎ গোস্বামীর আলোচনায় থাকতে বাধ্য, কারণ তাঁর মধ্যে ইতিহাসপ্রিয়তা শিল্পপ্রিয়তা অপেক্ষা বেশী স্থান লাভের অধিকারী। সমস্ত গ্রন্থটি পাঠ করার পর মনে হয় উপন্যাসবিচারে লেখকের মন সংশয়ী। উপন্যাস সমালোচনার যে-বিভিন্ন মান সম্প্রতি পরিচিত, তাঁর সবগুলির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে, এমন প্রমাণ আমরা পাই। কিন্তু তিনি কোনো নির্দিষ্ট মান অনুসরণ না করায় তাঁর সমগ্র রচনাই কেমন যেন সাংবাদিকতা ঘেঁষা। আর তার মাত্রাধিক্য ঘটেছে, ভাষা সম্পর্কে তাঁর শিথিলতার জন্য।

অনেক শৈথিল্য সত্ত্বেও এর একটি পরিচ্ছদ এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। আর সেই

আলোচনাটি হচ্ছে 'বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা।' এই একটি মাত্র প্রবন্ধে লেখক মানিকবাবুর শিল্প-বোধের সম্যক এবং সার্থক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং এই প্রবন্ধ পাঠ করে মনে হয়, তাঁর অন্বেষণ প্রয়োজনে কত গভীর হতে পারে। এই প্রবন্ধেও তিনি ইতিহাসকে বিচারের প্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সর্বত্র তাঁর চেতনায় মূলগত-ভাবে ঐক্যবোধ থাকায় আলোচনাটি শিথিল হয়ে পড়েনি।

আধুনিক বাঙালী সমাজ ও বাংলা উপন্যাস' সম্পর্কে আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও পাঠকমনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করে। আর এই প্রশ্ন সৃষ্টিতেই মনে হয় লেখকের সার্থকতা।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

সংকট—সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শুধুমাত্র মানুষের ঘটনাপ্রধান বহির্জীবনের ভিত্তিতে সাহিত্যরচনার বাঁধা সড়ক ছেড়ে ভিন্নতর পথে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন যে দু'চারজন মুষ্টিমেয় বাঙালি লেখক, সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাইরের স্থূল ঘটনাকে সতীনাথ ভাদুড়ী যে একেবারে পরিহার করেন তা নয়, তাঁর লেখায় তার পরিচয়ও পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে মানবসত্তাতে কি ভাবনাচিন্তা অহরহ যাওয়া-আসা করে, তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেন তিনি; এবং এ জন্যে সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে তাঁর রচনা অনন্যতায় চিহ্নিত। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "সংকট" এর নজির হিসাবে উপস্থিত করা যায়।

"সংকট"-কে উপন্যাস বললে ভুল হবে। মানবজীবনের তথাকথিত অখণ্ড বা ধারা-বাহিক ছবি এতে পাওয়া যাবে না। জীবনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের গ্রন্থনায় এর আত্মপ্রকাশ; আর, ধনুচির প্রসঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত এই মুহূর্তগুলির অনুকথক সমাজসেবী যুক্তিনাথ বিশ্বাস, বিশ্বাসজী নামেই যিনি স্থানীয় অঞ্চলে সমধিক পরিচিত।

জনপ্রিয় বিশ্বাসজী নাতিপ্রৌঢ় বয়সে অকস্মাৎ রাজনীতি ও জনসেবা পরিত্যাগ ক'রে বাড়িতে এসে বসলেন। রাজধানী থেকে সবচেয়ে বড় নেতা ছুটে এলেন; অনেক উপরোধ-অনুরোধ করলেন; বিশ্বাসজী কিন্তু কিছুতেই আর পূর্ব জীবনে ফিরে গেলেন না। কাজের ঠাসবুননে ভরা রাজনীতি আর জনসেবার বৈচিত্র্যহীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসজীর তীব্রতম বিরক্তিই তাঁর এই নব জীবনে উদ্ধরণের উৎসমূল। কথিত আছে, তিন-তিনটে যুদ্ধের পর বিসমার্ক'ও কোন এক বিমুগ্ধ মুহূর্তে তাঁর বাগানবাড়িতে সকালবেলার আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তাঁর অতীত কর্মমুখর জীবনের কথা ভেবে। নিজের মনের দিকে ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন আছে, মাঝে মাঝে অবিরাম কর্মধারা থেকে অবসর গ্রহণ যে মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য, প্রত্যেক পরিশ্রমী কার্মিকের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত।

অবসরগ্রহণের পর দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বাসজী। প্রথমবারের দেশভ্রমণের সময় থেকে "সংকট"-এর কাহিনীর সূত্রপাত; কাহিনী অর্থাৎ কতকগুলি মুহূর্তের বিবরণ। এই সব মুহূর্তের আঙিনায় এসে জড়ো হয়েছে রেণু, মণি, মুনিয়া, সুনিয়ার মা, রঘুয়া,

দাড়িওলা-মহাত্মা, অঘোরীবাবা, গুজরাতীর মা প্রভৃতি বহুবিচিত্র চরিত্র। এদের প্রায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর; দোষে-গুণে প্রায় প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ও জীবন্ত; এবং এই চরিত্রচিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবনে অনির্বচনীয়তা নিয়ে এমন এক একটি মুহূর্ত এসে হাজির হয়, যখন মনে হয় সময়ের স্রোত স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, যখন সমস্ত যুক্তি, সমস্ত বুদ্ধিকে অবলুপ্ত ক'রে দিয়ে রাজত্ব করতে থাকে বিশ্বজোড়া বিস্ময় আর বিশ্বাস। এই ধরনের কতকগুলি মুহূর্ত বিশ্বাসজী তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফলে যে-বিশ্বাসজী এক সময় কোন ঘটনার যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যাতেই তৃপ্ত থাকতেন, কারও অন্যায় আচরণের বোঝবার মতো কারণ খুঁজে পেলেই শান্ত হ'য়ে যেতেন, তিনিই ঐ সব মুহূর্তের সংস্পর্শে আসার পর যুক্তি-বুদ্ধির ওপরে বোধি-অনুভবকে স্থান দিলেন; তিনি বুঝলেন পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে, যা কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোন উত্তর কখনো মেলে না। ফলত, কেন রেণু মুমূর্ষু শাশুড়ির শিয়রে তার বিকলাঙ্গ ভাণ্ডারের অদ্ভুত আদরকে বরণ ক'রে নিল, যে ভাশুরকে দেখে একদিন সে ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল, কেন ভোররাত্রের দিকে মঘইয়া-মেয়ে গুজরাতীর মা অঘোরীকে অনুসরণ করেছিল আর তার কাছে করুণ-কাতর মিনতি জানিয়েছিল তাকে তার সঙ্গী ক'রে নিতে কিংবা কেন নিজের অসফল সংসারজীবন ও আসন্ন মন্দ ভাগ্যের কথা ভেবে আত্মহননে উদ্যত দাড়িওলা মহাত্মা আত্মহত্যা না ক'রে পুনর্বার লোকারণ্যে ফিরে এল, এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাওয়া সত্যই দুরূহ; এবং যে সব মুহূর্তে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, মানুষের জীবনে সেই মুহূর্তগুলিই সব চাইতে বিস্ময়কর রকমের স্মরণীয়। "সংকট" বইতে সতীনাথ ভাদুড়ী এই ধরনের কতকগুলি আশ্চর্য মুহূর্ত প্রদক্ষ চিত্রকের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুহূর্তগুলি চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক ব্যক্তিচৈতন্যের প্রবাহী ধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং স্বভাবত অন্তর্মুখী মন ও কবিদৃষ্টির অধিকারী ব'লে মানুষের মনোলোক উদ্‌ঘাটনের কাজে তাঁর সাফল্য প্রশংসনীয়।

মুহূর্তগুলির কয়েকটিতে, যেমন ভোররাত্রে গুজরাতীর মার অঘোরীবাবাকে অনুসরণ বা সন্ন্যাসীর হাতে অভিশাপতীত রেণুর গহনার বাক্স তুলে দেওয়া, প্রভৃতির মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা কিছুটা অবাস্তবতা আছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু এমন অনেক কিছুই পৃথিবীতে ঘটে বা ঘটতে পারে, যাকে আমাদের অভিজ্ঞতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে ভুল হওয়া সম্ভব। আর বিশেষ ক'রে বিশ্বাসজীর 'যে কোন মুহূর্তকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে খানিকটা নাটকীয়তা আসতে বাধ্য তার মধ্যে'—কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে যখন।

বহুবিচিত্র চরিত্রের মিছিল "সংকট"কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। রেণু, মুনিয়া ও মুনিয়ার মা, রঘুয়া, গুজরাতীর মা প্রভৃতি নানান ধরনের চরিত্র। এদের কোনটি মোটা তুলির আঁচড়ে, কোনটি বা নির্বহ্নল রেখায় অঙ্কিত। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিই মনকে স্পর্শ করবার মতো জীবন্ত। যেহেতু আগেই বলেছি "সংকট" উপন্যাস নয়, সুতরাং কেউ যদি এ-সব চরিত্রের প্রত্যেকটির সমান ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখতে চান, তাহলে তিনি ভুল করবেন। জীবনের কয়েকটি বিচিত্র মুহূর্ত ও সে-সব মুহূর্তের কয়েকটি ঘটনার চিত্রণ এবং ঘটনার পটভূমিতে ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত দান করা লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব'লে চরিত্রগুলির বিকাশ বা পরিণতি সর্বত্র সমান হয়নি। এদের কোনটি দীর্ঘস্থায়ী,

কোনটি স্বল্পস্থায়ী। ঘটনাচক্রে কেউ এসে চলে গেছে, কেউ বা অনেকক্ষণ থেকে গেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও লেখকের কাছের জগৎ থেকে আহৃত এই সব চরিত্রের অনেকগুলিরই হাসি-কান্না-ভরা জীবন পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়।

পরিবেশসৃষ্টির ব্যাপারেও সতীনাথ ভাদুড়ী সিদ্ধহস্ত। রেণুর বিয়ে উপলক্ষ্যে বিয়ে-বাড়ির কর্মমুখরতা বা রেণুর মুমূর্ষু শাশুড়ীর ঘরে এবং ঘরের পাড়াপড়শীর ভিড় ও কথোপকথনের মধ্যে তাঁর বর্ণনাজ্ঞান ও পরিবেশ রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে মুনিয়ার উপর রেণুর পিসিমার সন্দেহ বা বিশ্বাসজীর রাজধানীর নেতাকে সরকারী রাস্তার শ্রীহীন গাছগুলিকে কেটে ফেলার অনুরোধ জ্ঞাপনের মধ্যে উক্ত নেতা কর্তৃক বিশ্বাসজীর অভিসন্ধি সন্ধানের চেষ্টার মধ্যে লেখকের মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রমাণ মেলে। এ-ছাড়া নদীতীরবর্তী সতীথান ও সেখানে সন্তানকামী মেয়েদের সন্তানকামনায় ইঁট বাঁধার বর্ণনার মধ্যে একটি চমৎকার স্থানীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত